পরিবেশ বিজ্ঞান

মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ ও পানি সেচ

মোঃ সদরুল আমিন

পরিবেশ বিজ্ঞান
মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ ও পানি সেচ

Web.

পরিবেশ বিজ্ঞান

মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ ও পানি সেচ

BANSDOC Library
Acc. No. ১৬৬৯১
Call No. ৬৩৩.৭ আমিপ
Date 10.6.04 Sign.

ড. মোঃ সদরুল আমিন
ধ্যক্ষ
হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

পরিবেশ বিজ্ঞান : মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ ও পানি সেচ
(কৃষি পরিবেশ বিজ্ঞান : মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ, মৃত্তিকা পানি ও পানি সেচ)

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ জুন ১৯৯৭

বা/এ (৯৬-৯৭ পাঠ্যপুস্তক : জী কৃ চি : ১৬) ৩৫৫১

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জী কৃ চি ২৪৩

প্রকাশক
সেলিনা হোসেন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

BANDOC library
Accession No. 16351
Date

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মোঃ ফখরুল হোসেন

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

PARIBESH BIJNAN : MRITTIKA SRENIKARAN O PANI SECH (Environmental Science : Soil Classification and Water Irrigation) by Dr. Sadrul Amin. Published by Selina Hossain, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000. Bangledesh. First edition : June 1997. Price : Taka 60.00 Only.

ISBN 984-07-3560-8

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধের পিতা
মরহুম মোঃ মকবুল হোসেন
স্মরণে—

ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সমন্বিতভাবে কৃষি, মৃত্তিকা, সেচ ও কর্ষণ কার্যাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার বৈজ্ঞানিক পরিচর্যা বিশেষ করে সার, সেচ ও ভূমিকর্ষণ এবং ভূমি সংরক্ষণ প্রক্রিয়াসমূহ প্রতিপালন একান্ত জরুরি।

যথেচ্ছা কৃষি কাজ যা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মৃত্তিকার অবক্ষয় ঘটায় তা সনাক্ত করার জন্য মৃত্তিকার শ্রেণীকরণ, এর গুণাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্য জানা থাকা আবশ্যক। এসব বিষয় স্মরণে রেখেই এই গ্রন্থে কৃষি, মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ, পানি সেচ, নিকাশ ও ভূমি পরিচর্যা বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্নাতক সম্মান শ্রেণীর মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং বিশেষ করে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠ্যসূচির অনুসরণে প্রণীত এই গ্রন্থ পাঠ করে সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করবো।

বইটিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু কিছু ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহপূর্বক ত্রুটিগুলো অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা পরিশোধন করা যাবে। এতে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

ড. মোঃ সদরুল আমিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : কৃষি পরিবেশ ও কৃষির ইতিহাস ১—১৫
১. কৃষি ও পরিবেশ ১
২. কৃষির ইতিহাস ৪
৩. ভূমির উর্বরতা ও উদ্ভিদ পুষ্টি ৫
৪. বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কৃষি উন্নয়ন ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : মৃত্তিক শ্রেণীকরণ ১৬—২৮
১. মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের ঐতিহাসিক বিবরণ ১৬
২. টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকা বর্গ ও উপবর্গ ১৮
৩. মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী ও নামাংশ ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : মৃত্তিকা বর্গের বিবরণ ২৯—৪৩

চতুর্থ অধ্যায় : মৃত্তিকা পানির গুরুত্ব ও শ্রেণীকরণ ৪৪—৫৯
১. প্রাকৃতিক পানিচক্র ৪৪
২. মৃত্তিকা পানির শ্রেণীকরণ ৫২

পঞ্চম অধ্যায় : মৃত্তিকা পানির বিভব, চলাচল ও ব্যবস্থাপনা ৬০—৮৩
১. মৃত্তিকার পানি বিভব ৬৩
২. মৃত্তিকা পানির চলাচল ৬২
৩. মৃত্তিকা পানির ভোগ্য ব্যবহার ও পরিমাপ ৭০
৪. মৃত্তিকা পানির ব্যবস্থাপনা ৭৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : পানি সেচ ৮৪—৮৯
১. পানি সেচের গুরুত্ব ৮৪
২. সেচপানির ব্যবহার ৮৪
৩. সেচের পানির পরিমাপ ৮৭

সপ্তম অধ্যায় : পানি সেচ পদ্ধতির বিবরণ ৯০—১০৯

অষ্টম অধ্যায় : পানি নিকাশ ১১০—১২৪
১. বাংলাদেশে পানি নিকাশের গুরুত্ব ১১০
২. পানি নিকাশ পদ্ধতি ১১৭

নবম অধ্যায় : ভূমিকর্ষণ ১২৫—১৩৮
১. ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা ১২৫
২. ভূমিকর্ষণের পদ্ধতি ও প্রকার ১২৮

তথ্যপঞ্জি ১৩৯

চিত্র সূচি

১. পরিবেশ ও কৃষিকাজের সম্পর্ক ২
২. পরিবেশ সংরক্ষণের সমন্বিত কৃষি প্রযুক্তি বাছাই ৩
৩. কৃষি গবেষণার সাফল্যের দিক ৪
৪. বিজ্ঞানী থিওফ্রাসটাস (২৮৭ খ্রিস্টপূর্ব) ৮
৫. বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিস্টপূর্ব) ৮
৬. বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ভন লিউয়েন হুক (১৬৩২–১৭২৩) ৮
৭. বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭–১৭৭৮) ৮
৮. বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (১৮২২–১৮৯৫) ৮
৯. বিজ্ঞানী রবার্ট কচ (১৮৪৩–১৯১০) ৯
১০. বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান্স মেন্ডেল (১৮২২–১৮৮৪) ৯
১১. বিজ্ঞানী ভি. আই. আইয়ানেফিল (১৮৬৪–১৯২০) ৯
১২. বিজ্ঞানী মার্টিনাস বিজরিঙ্ক (১৮৩৪-১৯৩১) ৯
১৩. বিজ্ঞানী অগাস্ট ওয়াইজম্যান (১৮৩৪–১৯৩৪) ১০
১৪. বিজ্ঞানী এস. এন. উইনোগ্রেডস্কি (১৮৫৬–১৯৫৩) ১০
১৫. বিজ্ঞানী টমাস হান্ট মার্গান (১৮৬৬–১৯৪৫) ১০
১৬. আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ১০
১৭. জলবায়ু ও মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ ১৯
১৮. মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে উডিক আর্দ্রতার বৈশিষ্ট্য২১
১৯. মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে উস্টিক আর্দ্রতার বৈশিষ্ট্য ২১
২০. মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে এরিডিক আর্দ্রতার বৈশিষ্ট্য২১
২১. বাংলাদেশের একক ও মিশ্র প্রধান প্রধান এন্টিসল মাটির এলাকা ৩১
২২. বাংলাদেশের একক ও মিশ্র প্রধান প্রধান ইনসেপ্টিসল মাটির এলাকা ৩২
২৩. বাংলাদেশের একক ও মিশ্রভাবে প্রধান প্রধান হিস্টোসল, আলফিসল, অক্সিসল ও অন্যান্য মাটির এলাকা ৩৩
২৪. পানি শুকিয়ে ফেটে যাওয়া ভার্টিসল মৃত্তিকা ৩৮
২৫. ভার্টিসল মৃত্তিকা তৈরির প্রক্রিয়া ৩৯
২৬. ভূ-পৃষ্ঠ পানির প্রবাহ ধারা ৪৫

২৭. সরল পানিচক্র ৪৬
২৮. প্রাকৃতিক পানি চক্রে বাষ্পায়ন ও প্রবাহ ৪৭
২৯. মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও বায়ুমণ্ডলে পানি প্রবাহ চক্র ৪৮
৩০. মৃত্তিকা কণায় পানি মৌলে আধানের অবস্থান ও পোলারিটি ৫০
৩১. মৃত্তিকা কণা ও পানি মৌল ৫০
৩২. মৃত্তিকা কণায় পানি উপশোষণ ৫১
৩৩. মৃত্তিকা কণা ও পানির অবস্থানভিত্তিক প্রকার ৫১
৩৪. মৃত্তিকা কণায় পানি মৌলের ইলেকট্রন বিনিময় ও বন্ধন ৫২
৩৫. মৃত্তিকায় পানির শ্রেণীভিত্তিক অবস্থান ৫৩
৩৬. মৃত্তিকার শ্রেণীভিত্তিক আর্দ্রতা প্রাপনীয়তা ৫৩
৩৭. মৃত্তিকা পানির বিভিন্ন শ্রেণীতে পানি ও বায়ুর আনুপাতিক পরিমাণ ৫৫
৩৮. মাঠ ক্ষমতা ও নুয়াঙক অবস্থায় মাটিতে পানির অবস্থান ৫৬
৩৯. পানি সম্পৃক্ত ও চুল্লী শুকনো মাটিতে পানির অবস্থান ৫৮
৪০. মৃত্তিকার বুনট ও মৃত্তিকার প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা ৫৭
৪১. মৃত্তিকার বুনটভিত্তিক ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল বার ৫৯
৪২. সরু কৈশিক নলে পানির উত্থান ৬৩
৪৩. কৈশিক নল ও পানির চাপ (গ্রাম/ সে. মি.২) ৬৪
৪৪. মৃত্তিকা কলামে পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ ৬৫
৪৫. বেলে দো-আঁশ মাটিতে পানি চলাচল ৬৫
৪৬. এঁটেল মাটিতে পানি চলাচল ৬৬
৪৭. মাঠ লাইসিমিটারের কাঠামো ৭৫
৪৮. মারকারি টেনসিওমিটার ৭৬
৪৯. ভ্যাকুয়াম গজ টেনসিওমিটার ৭৭
৫০. মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণের বার টেনশন রেখা ৭৭
৫১. নিউট্রন প্রোব যন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণ ৭৮
৫২. জিপসাম ব্লক দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণ ৭৯
৫৩. নিউট্রন প্রোব পাঠ রেখা ৭৯
৫৪. জিপসাম ব্লক পাঠ রেখা ৮০
৫৫. মাটির আর্দ্রতা নির্ধারণের জন্য প্রেসার মেমব্রেন যন্ত্র ৮১
৫৬. দো-আঁশ মাটির পাহাড়ীঢালে ডোরা চাষের মাধ্যমে সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ৮২
৫৭. কন্টোর চাষ পদ্ধতিতে সেচপানি নিয়ন্ত্রণ ৮৩
৫৮. পানি সেচের মুক্ত প্লাবন পদ্ধতি ৯১

৫৯. এঁটেল মাটিতে ধানের ঢালু জমিতে চেক বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ ৯৩
৬০. দো-আঁশ মাটির ফল বাগানে রিং বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ ৯৪
৬১. মৃত্তিকা পানি ও ফসলের শিকড় গভীরতা ৯৫
৬২. পানি দো-আঁশ মাটিতে বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিতে পানি সেচ ৯৬
৬৩. দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটিতে সবজি বাগানে নালা সেচ পদ্ধতি ৯৯
৬৪. দো-আঁশজাতীয় মাটিতে মাঠ ফসলে করুগেশন পদ্ধতিতে পানি সেচ ১০১
৬৫. বর্ষণ পানি সেচ পদ্ধতি ১০৬
৬৬. দো-আঁশ মাটিতে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ১০৯
৬৭. অনিষ্কাশিত জমিতে ফসলের বৃদ্ধি ১১৩
৬৮. টাইল নিকাশযুক্ত জমিতে ফসলের বৃদ্ধি ১১৪
৬৯. প্রাকৃতিক মুক্ত নালা নিকাশ পদ্ধতি ১১৫
৭০. প্লাস্টিক টিউব নালা বসানোর পদ্ধতি ১১৮
৭১. মোল নালা তৈরির লাঙ্গল ১২০
৭২. জমিতে মোল নালা স্থাপন পদ্ধতি ১২০
৭৩. পানি নিকাশের সরু নালা ও প্রশস্ত নালা ১২০
৭৪. পানি নিকাশের প্রাকৃতিক ও ইন্টারসেপশন পদ্ধতি ১২১
৭৫. পানি নিকাশের গ্রিডিরন (ক) ও হেরিংবোন পদ্ধতি (খ) ১২২

সারণি সূচি

১. বিশ্বের অনাবাদী জমির পরিমাণ (কোটি হেক্টর) ১৩
২. আর্দ্র-উষ্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকার শ্রেণীভিত্তিক জমির আয়তন (%) ১৪
৩. অর্ধ-আর্দ্র উষ্ণ এলাকার মৃত্তিকা শ্রেণীভিত্তিক জমির আয়তন (%) ১৫
৪. বিশ্বে বিভিন্ন মৃত্তিকা বর্গের অধীন জমির পরিমাণ ২২
৫. উচ্চ উর্বরতাসম্পন্ন মৃত্তিকা উপবর্গের বিবরণ ২৩
৬. মধ্যম উর্বরতাসম্পন্ন মৃত্তিকা উপবর্গের বিবরণ ২৩
৭. নিম্ন উর্বরতা সম্পন্ন মৃত্তিকা উপবর্গের বিবরণ ২৪
৮. টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মৃত্তিকার প্রধান প্রধান বর্গ, উপবর্গ ও সিরিজের সংখ্যা ৩৫
৯. কৈশিক পানি, বাষ্পার্দ্রিক পানি ও মাধ্যাকর্ষী পানির মধ্যে পার্থক্য ৫৪
১০. মাটিতে ৩০ সে.মি. গভীরতায় বুনটভেদে পানির পরিমাণ ৬৯
১১. ফসল সহগ (Kc) ৭১
১২. বিশ্বের কয়েকটি দেশের চাষযোগ্য জমি ও সেচকৃত জমির পরিমাণ ৮৪
১৩. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পের নাম ও সেচাধীন জমির পরিমাণ ৮৫
১৪. একক পানির পরিমাপ ও ফসলের উৎপাদন ৮৬
১৫. মাটির ঢাল, অনুপ্রবেশ হার এবং বুনট অনুসারে পানিস্রোতের আকার ৯৭
১৬. দো-আঁশ ও এঁটেল মাটিতে পানি চলাচল তথ্য ১০২
১৭. অনুপ্রবেশ হার নির্ণয়ের প্রদত্ত তথ্য ১০৩
১৮. অনুপ্রবেশ হার নির্ণয় সমাধান ১০৩
১৯. জমির ঢাল অনুসারে নালার সাধারণ দৈর্ঘ্য (মিটার) ১০৪
২০. মাটির বুনট, জমির ঢাল ও বর্ষণ পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ হার (সে. মি./ঘণ্টা ১০৭
২১. মাটির তাপ ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম সময় ১২৬

প্রথম অধ্যায়

কৃষি পরিবেশ ও কৃষির ইতিহাস

১। কৃষি ও পরিবেশ

আধুনিক বিশ্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এত ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে এসব বিষয় আলাদা করে চিন্তা করা যায় না। সমকালীন অনেক বিজ্ঞানীর মতে, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক করার নামে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করছে।

আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা আজ যন্ত্র, দ্রব্য ও জ্ঞান এই তিনটিতেই সমৃদ্ধ। তবে পরিবেশের জন্য সহ্যশীল মাত্রায় এসব যন্ত্র, দ্রব্য ও জ্ঞান সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর অনেক সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এজন্য কৃষি ব্যবস্থা ও পরিবেশ ব্যবস্থাকে পাশাপাশি বিবেচনা করতে হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করা যায় --

আধুনিক ব্যবস্থার চারটি প্রধান বিষয় হচ্ছে

১. কৃষির ক্রমবিবর্তনভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ধারণ ;
২. মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বা শ্রেণীকরণ ও এর ভিত্তিতে মৃত্তিকার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ;
৩. সার, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ;
৪. ভূমিকর্ষণ ও ভূমির উর্বরতা ব্যবস্থাপনা।

অপরদিকে বিপন্ন পরিবেশের প্রধান চারটি বিষয় হচ্ছে

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমবিপর্যয় ;
২. মৃত্তিকার অনুপযুক্ত ব্যবহার ;
৩. খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ;
৪. ভূমিক্ষয়।

একটু চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কৃষি ও পরিবেশের এসব বিষয়ে ঘনিষ্ট মিল রয়েছে। একটি প্রক্রিয়া আরেকটি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। একটি প্রক্রিয়া আরেকটি প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করেছে। একটি সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে আরেকটি সম্পদ নিঃশেষ করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো ছকে সাজালে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বুঝতে সুবিধা হবে।

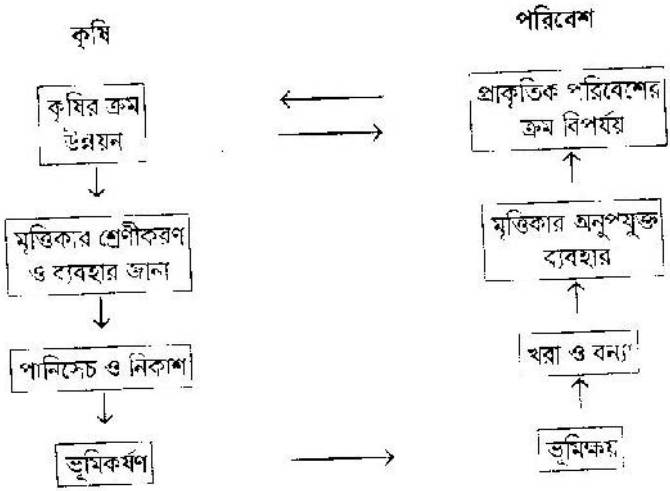

চিত্র ১ : পরিবেশ ও কৃষিকাজের সম্পর্ক

তীব্র ভূমিকর্ষণ ভূমিক্ষয় ঘটায়। ভূমিক্ষয় ভূমির উর্বরতা হ্রাস করে। নদী-নালায় পলি জমে বন্যা সৃষ্টি হয়। জলাধারের গভীরতা কমলে সংরক্ষিত পানির পরিমাণ কমে, সেচের পানির অভাব হয়, খরা দেখা দেয়। এতে মাটির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হয় না।

অপরদিকে, অধিক কৃষি উৎপাদনের জন্য ভূমিকর্ষণ দ্বারা মাটি নিবিড়ভাবে আলোড়িত হচ্ছে। পাহাড়, পাহাড়ী ঢাল, ঢালের নিচে ঝরণার ধার ও ঝরণা, নদী-নালা ও ভূ-নিম্নস্থ পানি দিয়েও সেচ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাকৃতিক অবস্থান থেকে পাথর, শিলা সরিয়ে অন্যত্র নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবে ভূমির প্রাকৃতিক ক্রম-অবক্ষয় তীব্র আকার ধারণ করছে। কৃষি উন্নয়ন ও ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়া চালু হয়েছে অনেক আগেই।

কৃষির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, কৃষির একেকটি নব নব আবিষ্কার বাস্তবায়নের সময় প্রকৃতিকে যথোপযুক্তভাবে গ্রাহ্য করা হয়নি।

যুগে যুগে একেকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষের মুখে পতিত হওয়ার পর মানবজাতিকে রক্ষার জন্য কৃষি উন্নয়নে সুবিধাভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হয়েছে। ক্রমবর্ধমান মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ে ব্যবস্থার জন্যই প্রধানত তা করতে হয়েছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন কাজ থেমে নেই। ভূমিকর্ষণ, পানি সেচ, নিকাশ, মৃত্তিকার পানি আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে ও স্থানীয় এলাকাভিত্তিক ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। এখানে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রযুক্তিগুলোর সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে একটি অপরটির জন্য ক্ষতিকারক না হয়ে বরং সম্পূরক হয়।

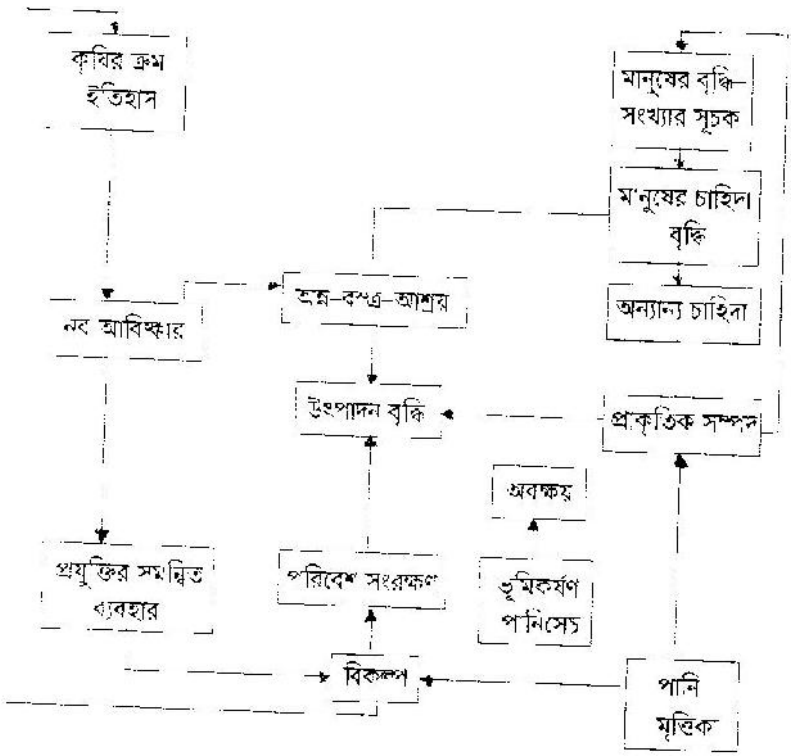

চিত্র ১ : পরিবেশ সংরক্ষণের সমন্বিত কৃষি প্রযুক্তি বাছাই

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষির নিজস্ব ইতিহাস ও কর্ম বিবর্তন এবং কৃষি ও পরিবেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া কার্যক্রম প্রভৃতির সমন্বিত বিবেচনা প্রয়োজন। যেমন —

১. মৃত্তিকা ও পানি : এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— মৃত্তিকা ও পানি ব্যবস্থাপনা।
২. মৃত্তিকা, উন্নত ফসলজাত : এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— ফসল চাষে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা।
৩. মৃত্তিকা, পানি ও ফসলজাত : এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে— অধিক উৎপাদন।

এই গ্রন্থে তাই পরিবেশ বিজ্ঞানের একটি অংশ হিসেবে প্রধান বিষয়াবলীর মৌলিক তথ্য ও চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে :

১. কৃষির প্রধান প্রধান ঘটনাক্রম ;
২. মাটিকে জানার জন্য যেভাবে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ করা হচ্ছে ;

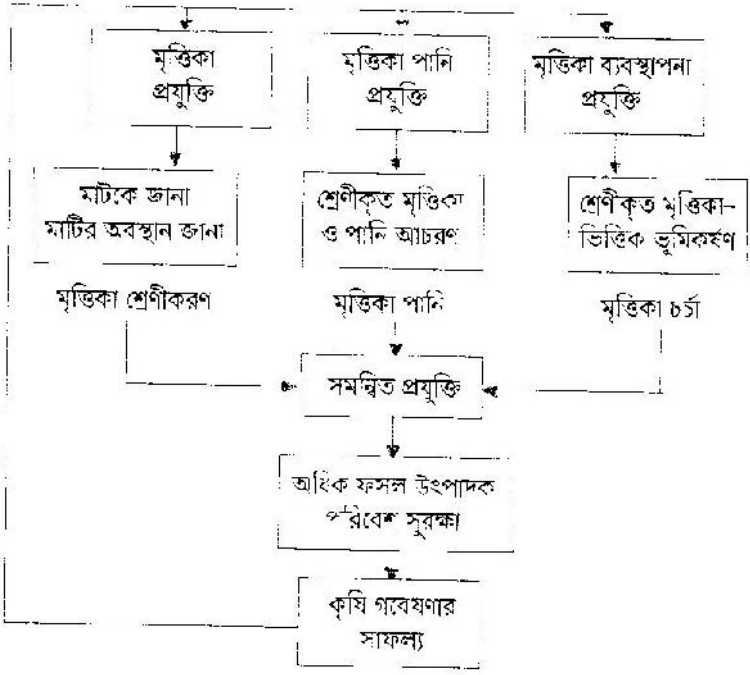

চিত্র ৩ : কৃষি গবেষণার সাফল্যের দিক

৩. মৃত্তিকা ও পানি আচরণ ;

৪. মৃত্তিকা চর্চা বা ভূমিকর্ষণ ।

এসব বিষয়ের যথোপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবহার কৃষি ও পরিবেশে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অনুকূলে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।

২। কৃষির ইতিহাস

কৃষি আবির্ভাবের পর থেকে লক্ষ লক্ষ বছরব্যাপী অত্যাবশ্যক চাহিদার তাগিদে মানুষ নানা ধরনের পরিবর্তন অতিক্রম করেছে। এসব পরিবর্তন ধারার ভিত্তিতে কৃষির ইতিহাসকে নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায় —

১. **প্রারম্ভকাল :** খাদ্য সংগ্রহ, আদিম পর্যায়, শিকার পর্যায় ও যাযাবর পর্যায় ;
২. **প্রাচীনকাল :** খাদ্য সংরক্ষণ, পশু পালন, ফল ও ফসল উৎপাদন পর্যায় ;
৩. **মধ্যযুগ :** ভূমিকর্ষণ এবং জমির পানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা ;
৪. **প্রারম্ভিক উন্নয়ন যুগ :** বীজ ও অন্যান্য উপকরণ, উৎপাদন কৌশল, উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়নের উন্নয়ন, কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কৃষি গবেষণার প্রারম্ভিক পর্যায় ;

৫. **প্রকৃত উন্নয়ন বা স্বর্ণ যুগ :** জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং কৃষি গবেষণার ভিত্তি দৃঢ়করণ ;

৬. **বর্তমান যুগ :** উদ্ভিদ প্রজনন, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত কৃষি পদ্ধতির বিবর্তন ও পরিবর্তনের জন্য কতকগুলো পরিস্থিতি বা সমস্যা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ; যেমন - -

১. লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণগত ঘাটতি ;

২. ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ;

৩. যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ ;

৪. সমাজে প্রাধান্য বিস্তার, বস্ত্র, বাসস্থান ও বিলাসিতার অভিলাস ;

৫. সম্পদ আহরণ ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা লাভ ;

ইতিহাসের ধারণা থেকে উল্লেখ করা যায়, প্রায় কয়েক লক্ষ বছর যাবত মানব জাতি কেবল পরবর্তী এক বেলার আহার যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিল। এবং এর বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন সে সময় দেখা দেয়নি। উল্লেখ করা যায়, ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছে ৮ থেকে ১০ হাজার বছর পূর্বে। মানুষ এ পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১৫০ টি উদ্ভিদকে কৃষি কাজে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হয়েছে।

অবশ্য মানুষের খাদ্য ও জৈবনিক শক্তি সরবরাহকারী হিসেবে ১০ থেকে ১৫ টি উদ্ভিদের ব্যবহারই ব্যাপক ছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূ তত্ত্ববিদগণের মতে প্রায় একই সময়ে পৃথিবীর একাধিক স্থানে, কৃষি কাজের উদ্ভব হয়েছে। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে– পশ্চিম ভারত থেকে পূর্ব-ভূ-মধ্যসাগর এলাকা (যেমন, ইরাক), চীন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা। পৃথিবীর উৎস থেকে মানব জাতির আবির্ভাব পর্যন্ত বিবর্তনিক ঘটনাক্রম ও সময়কে নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়—

১. পৃথিবীর বয়স : ৪৩০ থেকে ৫০০ কোটি বছর ;

২. জীবের উদ্ভব : ২০০ কোটি বছর পূর্বে ;

৩. মানব জাতির পূর্ব পুরুষের আবির্ভাব : ২ লক্ষ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ

৪. বর্তমান জাতির আবির্ভাব : ৩০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ। চীন দেশে পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার আদি মানুষের জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য উক্ত সময়সীমা আনুমানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। ভূমির উর্বরতা ও উদ্ভিদ পুষ্টি

ভূমির উর্বরতা ধারণার উন্মেষ

ইরাকের টাইগ্রিস (Tigris)ও ইউফ্রেটিস (Euphrate) নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia) এলাকায় জমি বিশেষে বার্লির ফলনে পার্থক্য পরিলক্ষিত (প্রায় ১০০ গুণ পার্থক্য) হওয়ায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সালে উদ্ভিদ পুষ্টি ও মৃত্তিকা বিষয়ে মানুষের মাঝে কৌতূহল

সৃষ্টি হয়। এটিই মেটামুটিভাবে ভূমির উর্বরতা ধারণার উৎস। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে জমিতে গোবর, সবুজ সার, ছাই ও চুন প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন থিউফ্রাটাস (Theophratus), জেনোফন (Xenophon), ভির্জিল (Virgil) প্রমুখ চিন্তাবিদ। কলুমেলা (columella) মাটির খাদ পরীক্ষা দ্বারা অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি সনাক্তকরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

রোমের পতনের পর পিট্রো ডি-ক্রেসেনিজ (Pietor de Crescenz) ১২৩০ থেকে ১৩০৭) অপাস রুরালটাম কমোডোরাম (*Opus ruraltum commodorum*) নামক পুস্তক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে কৃষি উন্নয়ন কার্যাবলীতে পুনরায় গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়। উক্ত লেখককে অনেকে আধুনিক কৃষির প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন।

মৃত্তিকা ব্যবহারের ইতিহাস

বিশ্ব কৃষির ইতিহাস ও ভূমির উর্বরতার ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কৃষির উৎসের শুরুতেই মৃত্তিকা উর্বরতা সম্পর্কে চিন্তাবিদগণের অনুসন্ধিৎসা জেগেছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে মানুষ সর্বপ্রথম উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন।

উদ্ভিদের খাদ্যের উৎস, প্রকার, পরিমাণ, খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি, ভূমিকর্ষণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সব কিছুই ভূমির উর্বরতা সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের যাযাবর জীবন যাপনের প্রধান কারণ ছিল ভূমির উর্বরতা ক্রম অবক্ষয়। ভূমির উর্বরতা এবং মৃত্তিকা সংক্রান্ত নানাবিধ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কৃষির ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে। কৃষি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তুলেছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে পরবর্তীকালে সমাজ গঠন ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে।

উদ্ভিদের পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা

প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও তাদের উল্লেখযোগ্য মতবাদতত্ত্ব ও ধারণা নিচে উপস্থাপিত হলো—

১. ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) : ১৫৬১–১৬২৪ উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টিকারক হচ্ছে পানি। একই জমিতে একই গাছ অনবরত বেশি দিন উৎপন্ন করলে ফলন কমে যাবে।

২. জে. বি. ভন হেলমন্ট (J. B. von Helmont) : ১৫৭৭–১৬৪৪ উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টিকারক হচ্ছে পানি

৩. অভার্ট বয়েল (Obert Boile) : ১৬২৭–১৬৯১ লবণসহ পানি স্পিরিট, মাটি ও তেল উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য।

৪. জে. আর. গ্লেবার (J. R. Glauber) : ১৬০৪-১৬৬৮ পানি ও সল্টপিটার ($NaNo_3$) উদ্ভিদের জন্য খুবই উপকারী।

৫. জেথ্রো টুল (Jethro Tull) : ১৬৭৪–১৭৪১ উদ্ভিদের খাদ্য হচ্ছে সূক্ষ্ম মাটি কণা।

৬. আর্থার ইয়ং (Arthur Young) : ১৭৪১–১৮২০ ফলন বৃদ্ধিকারী উৎপাদন বিষয়ে ৪৬ টি খণ্ডে (annals of horticulture) প্রকাশ করেন।

পূর্বে বর্ণিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ বিষয়ক আবিষ্কারের সহায়তায় উদ্ভিদ পুষ্টি প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে থিউডোর ডি সস'র (Theodorede saussure) ব্যাপক অবদান রাখেন।

উদ্ভিদ পুষ্টি ও মৃত্তিকা উর্বরতা ধারণার উদ্ভাবনকারীগণের নাম ও অবদান নিচে উপস্থাপন করা হলো –

১. জে. বি. বসিংগল্ট (J.B. Baussingault) : ১৮০২–১৮৮২ উর্বরতা ও মাঠ প্লট পরীক্ষা।
২. জাস্টাস ভন লিবিগ (Justus von Liebig) : ১৮০৩–১৮৭৩ হিউমাস রহস্য ও মাটির প্রক্রিয়া।
৩. লয়েস ও লিবিগ (Lawes and Liebig): ১৮৪৩ লিবিগ সূত্র ব্যাখ্যা
৪. থমাস ওয়ে (Thomas Way) : ১৮৫২ আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা।
৫. থিউডোর সুয়েজিং ও আলফ্রেড মুঁজ (Theodoer Schoeesing and Alfred Muja) : ১৮৭৮ নাইট্রিকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা।
৬. এস. ইউইনোগ্রেডস্কি (S.Winogradsky) : নাইট্রিকরণ ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ।
৭. হেলরিগেল ও উইলফর্থ (Hellrigel and Wilfarth) : ১৮৮৬ নডিউল ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
৮. এম. ডব্লিউ. বিজারিঙ্ক (M. W. Beijerink) : ১৮৯৫ নডিউল ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ।

৪। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কৃষি উন্নয়ন

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ইংলিশম্যান জেথ্রো টুল (১৬৭৪–১৭৪১) একজন কৃষকের অনুরূপ চাষাবাদ করার সময় উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিষয়ে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পুস্তিকাকারে সন্নিবেশিত তাঁর এসব তথ্য থেকে আর্থার ইয়ং (Arthur Young) পরবর্তীকালে (১৭৪১–১৮২০) উন্নয়নমুখী গবেষণার সূচনা করেন।

সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতকের আবিষ্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ –

১. অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন : এন্থনি ভন লিউয়েনহুক (Anthony von Leewennhoek) : (১৬৯৩–)।
২. উদ্ভিদ কোষ বর্ণনা : রবার্ট হুক (Robert Hooke) (১৬০৫-১৭০৩)।
৩. অণুজীব পর্যবেক্ষণ : এন্থনি ভন লিউয়েনহুক (১৬৪২–১৭২৩)।
৪. উদ্ভিদ প্রজনন বিষয় বর্ণনা : রাডল্ফ জেকব কেমেরিয়স (Rudolph Jacob Cameraeus) : (১৬৬৫–১৭২১)
৫. জীব শ্রেণীকরণ সূত্র : কার্ল ভন লিনি (Carl von Linne) (১৭০৮-১৭৭৮)।
৬. শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা : জোসেফ প্রিস্টলি (Joseph Priestley) (১৭৩৩-১৮০৪)।
৭. বংশগতি সূত্র উদ্ভাবন : গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johan Mendel) (১৮২২-১৮৮৪)।

চিত্র ৪

বিজ্ঞানী থিওফ্রাসটাস (২৮৭ খ্রিস্টপূর্ব)

চিত্র ৫

বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)

চিত্র ৬

বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ভন লিউয়েন হুক (১৬৩২–১২২৩)

চিত্র ৭

বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭–১৭৭৮)

চিত্র ৮

বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (১৮২২–১৮৯৫)

চিত্র ৯

বিজ্ঞানী রবার্ট কচ (১৮৪৩–১৯১০)

চিত্র ১০

বিজ্ঞানী গ্রেগর জোহান্স মেন্ডেল (১৮২২–১৮৮৪)

চিত্র ১১

বিজ্ঞানী ডি : আই . আইয়ানোফিল (১৮৬৪–১৯২০)

চিত্র ১২

বিজ্ঞানী মার্টিনাস বিজারিঙ্ক (১৮৩৪–১৯৩১)

চিত্র ১৩

বিজ্ঞানী অগাস্ট ওয়াইজম্যান (১৮৩৪–১৯৩৪)

চিত্র ১৪

বিজ্ঞানী এস. এন. উইনোগ্রেডস্কি (১৮৫৬–১৯৫৩)

চিত্র ১৫

বিজ্ঞানী টমাস হান্ট মার্গন (১৮৬৬–১৯৪৫)

চিত্র ১৬

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু

কৃষি গবেষণার অগ্রগামী হিসেবে জন বেনেট লয়েস (John Bennet Lawes, ১৮১৪–১৯০১) এবং জোসেফ হেনরি গিলবার্ট (Joseph Gilbert, ১৮১৭–১৯০১) কৃষি বিপ্লবের যুগান্তকারী রথামস্টেড গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সমসাময়িককালে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)(১৮২২ ১৮৯৫) বীজাণুতত্ত্বের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেন।

বিপর্যয় ও কৃষি পরিবর্তন

বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি বড় প্রেক্ষিত হচ্ছে, মানুষ ও সমাজের সমস্যা ও চাহিদা। যুগে যুগে মানুষ যতো বিভিন্নমুখী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে ততোবারই তাদের বেঁচে থাকার জন্য, অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কৃষি গবেষণা জোরদার করা হয়েছে

নানা ধরনের বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি দুর্ভিক্ষের নাম উল্লেখ করা হলো—

১. বিশ্ব দুর্ভিক্ষ : ৮৭৯ সালে।
২. জার্মান দুর্ভিক্ষ : ১২৯৫ সালে, প্রায় অর্ধেক জার্মান মারা গিয়েছিল
৩. হাঙ্গেরি দুর্ভিক্ষ : ১৫১৫ সালে
৪. পারস্য দুর্ভিক্ষ : ১৮৭০ সালে, প্রায় ১৫ লাখ লোক অর্থাৎ দেশের প্রায় এক–চতুর্থাংশ লোক মারা গিয়েছিল।
৫. চীন দুর্ভিক্ষ : ১৮৭৮ সালে, প্রায় ৯৫ লাখ লোক মারা গিয়েছিল।
৬. রাশিয়া দুর্ভিক্ষ : ১৮৯১ সালে, প্রায় পৌনে ৩ কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
৭. ভারত দুর্ভিক্ষ : ১৮৭৬ ও ১৯৪৩–৪৩ সালে।

১৮৭৬ সালের দুর্ভিক্ষের পূর্বে এই উপমহাদেশে কৃষি নিয়ে কেউ তেমন চিন্তা ভাবনাই করতে না। উপমহাদেশে সময়ে সময়ে দেখা দেওয়া দুর্ভিক্ষসমূহ মোকাবেলা করতে এখানে কৃষি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সমস্যার ভিত্তিতেই কৃষি ও খাদ্য কমিশন গঠন করে ঢাকার ফার্মগেটে ১৯০৮ সালে ঢাকা ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং করা হয়েছিল সাথে সাথে উন্নত খামার ও কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছিল।

সমকালীন কৃষি উন্নয়ন ধারা

ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার খাদ্য ও জীবন যাপন চাহিদা পরিপূরণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম সমকালীন গুরুত্বের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। একক কৃষি কার্যক্রম ছাড়াও প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে কৃষি সেক্টর রয়েছে নিচে কৃষি গবেষণা, উন্নয়ন ও সহযোগিতার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলো।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রধান প্রধান কৃষি সংস্থা

১. খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), রোম।
২. আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো।
৩. আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI), লস বেনস, ফিলিপাইন।
৪. উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (CIAT), কলোম্বিয়া।
৫. আন্তর্জাতিক গোল আলু গবেষণা কেন্দ্র (CIP), লিমা, পেরু।
৬. অবশুষ্ক উষ্ণমণ্ডলীর আন্তর্জাতিক ফসল গবেষণা কেন্দ্র (ICRISAT), হায়দারাবাদ।
৭. উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষির আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট (IITA), ইবাদান, নাইজেরিয়া।
৮. আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA), ভিয়েনা।
৯. আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন সংস্থা (IFDC)।
১০. আন্তর্জাতিক সয়াবিন গবেষণা প্রোগ্রাম (INTSOY)

আঞ্চলিক কৃষি সংস্থা

১. এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (AVRDC) তাইপে, তাইওয়ান।
২. শুষ্ক জমির কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম (ALADP), লেবানন
৩. কমনওয়েলথ কৃষি ব্যুরো (CAB), লন্ডন।
৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কৃষি গবেষণার আঞ্চলিক কেন্দ্র (SEARCA)।
৫. দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (SAARC)।

প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সার্ভিস ও অনুদান সংস্থা

১. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (AID/USAID)
২. জাতিসংঘ উন্নয়ন প্রকল্প (UNDP)
৩. রকফেলার (ROCKFELER) ফাউন্ডেশন
৪. ফোর্ড (FORD) ফাউন্ডেশন
৫. কেলোগ (KELLOG) ফাউন্ডেশন
৬. কানাডাস্থ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CIDA)
৭. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)
৮. এশিয়া ফাউন্ডেশন (AF)
৯. ডেনিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (DANIDA)
১০. ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টার (EWC)
১১. বিশ্ব ব্যাংক (WORLD BANK)
১২. সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (SIDA)
১৩. সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (SDC)
১৪. জাপানিজ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)

১৫. ভারত কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR)
১৬. পাকিস্তান কৃষি গবেষণা পরিষদ (PARC)
১৭. যুক্তরাষ্ট্র কৃষি সংস্থা (USDA)
১৮. অস্ট্রেলিয়ান ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্স ব্যুরো (ADAB), ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কৃষি সম্ভাবনা

সারা বিশ্বে এখনো অনেক জমি রয়েছে (বর্তমানে যে পরিমাণ চাষ হচ্ছে তার প্রায় সমান) যার উর্বরতা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করে চাষাধীনে আনা সম্ভব। এসব অনাবাদী জমির বিবরণ দেয়া হলো —

সারণি ১ : বিশ্বের অনাবাদী জমির পরিমাণ (কোটি হেক্টর)

মহাদেশ	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)
দক্ষিণ আমেরিকা	৬০
আফ্রিকা	৫৬
উত্তর আমেরিকা	২৪
এশিয়া	১২
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	১২
সোভিয়েত রাশিয়া	১২
ইউরোপ	৪

উৎস (KEYFITZ) : U S and World Population, ১২৮৪

উপরোক্ত জমির মধ্যে এক–তৃতীয়াংশের বৃষ্টিপাত মাত্রা ফসল উৎপাদনের অনুকূল, এক তৃতীয়াংশের জমি ৬ মাস শুষ্ক এবং এক–তৃতীয়াংশ জমি শুষ্ক এলাকায় অবস্থিত। এসব জমির উর্বরতা ও বন্ধুরতা পর্যবেক্ষণপূর্ণ।

মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় বিশ্বের কেবল ২% (১০৪০ মিলিয়ন হেক্টর) উত্তম কৃষি জমির আওতাধীন। প্রায় ৩ হাজার মিলিয়ন হেক্টর জমি মৃত্তিকা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি জমিতে পরিণত করা সম্ভব।

সারা বিশ্বে আরো কয়েক দশকের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। তবে এর জন্য অব্যাহত উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টা প্রয়োজন জমির পরিমাণ বাড়ানো এবং প্রতি একক পরিমাণ জমিতে উৎপাদন বাড়ানো— এ দুটোই এর জন্য অত্যাবশ্যক।

বিশ্বে গড় প্রতি ১০ বছরে ১মিলিয়ন করে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ব্যবস্থার জন্য বর্তমান উৎপাদনের ৩০% বাড়াতে হবে

ব্রাজিল ও আফ্রিকার অংশবিশেষ এবং শুষ্ক ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে ভূমি উন্নয়ন ও সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সারা বিশ্বে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চলছে।

সীমিত জমিতে অধিক উৎপাদন ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির মাধ্যমেই সম্পাদন করা সম্ভব।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, কৃষির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল পর্যায়ের কার্যক্রমে মৃত্তিকার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎ মানব বংশধর কেবল মৃত্তিকার সুষ্ঠু পরিচর্যা দ্বারাই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে।

বর্তমান ও ভবিষ্যত কৃষি উৎপাদন সম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্য মাটির বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। মাটিকে এর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক নিয়মে শ্রেণীকরণ করে বিভিন্ন দেশের কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

যে দেশে যতো উন্নতমানের জমি রয়েছে, সেদেশ কৃষিতে ততো উন্নত। এই উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বের মাটিকে প্রধান ১১টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। এখানে বিশ্বের কয়েকটি এলাকার মৃত্তিকার শ্রেণীভিত্তিক জমির আয়তন দেখানো হলো।

সারণি ২ : আর্দ্র (Humid Tropics) উষ্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকার শ্রেণীভিত্তিক জমির আয়তন (%)

মৃত্তিকা বর্গ	বিশ্ব	ল্যাটিন আমেরিকা	আফ্রিকা	এশিয়া
এন্টিসল	৮	৫	২০	২৪
ভার্টিসল	২	<১	<১	<১
ইনসেপ্টিসল	৯	৯	১৭	২৪
অক্সিসল	৬	৩২	১৫	৩৩
মলিসল	৯	--	--	২
এরিডসল	১৯	--	--	--
আল্টিসল	৯	৫০	৪০	৪
আলফিসল	১৩	৩	৫	৪
হিস্টোসল	১	-	১	৬
স্পোডোসল	৪	২	১	২
এন্ডোসল ও অন্যান্য	২০	--	--	--
বিশ্বে মোট পরিমাণ (কোটি হেক্টর)	১০৫০	৬৭	৪৫	৩৮

তথ্য সূত্র : NAS (1982) এবং USDA, 1986.

সারণি ৩ : অবআর্দ্র উষ্ণ (Semi-arid tropics) এলাকায় মৃত্তিকা শ্রেণীভিত্তিক জমির অয়তন (%)

মৃত্তিকা বর্গ	বিশ্ব	ল্যাটিন আমেরিকা	আফ্রিকা	এশিয়া
এন্টিসল	৮	৫	১৭	--
ভার্টিসল	২	--	--	--
ইনসেপ্টিসল	৯	--	৩	৯
আল্টিসল	৬	৩	২	৬
মলিসল	৯	--	--	--
এরিডিসল	১৯	১১	৩৩	১৫
অক্সিসল	৯	--	--	--
আলফিসল	১৩	৩৪	৩২	৩৮
হিস্টোসল	১	--	--	--
স্পোডোসল	৪	--	--	--
এন্ডোসল ও অন্যান্য	২০	৪৭	১৬	৩২
বিশ্বে মোট পরিমাণ (কোটি হেক্টর)	১০৫০	৩১	১৪৬	৩২

তথ্য সূত্র : NAS (1982) এবং USDA (1986)

উপরিলিখিত দুটি তালিকা থেকে দেখা যায় যে, বিশ্বের বিভিন্ন মাটিতে শ্রেণীগতভাবে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের ভিত্তি এবং প্রতিটি মৃত্তিকা বর্গের কৃষি উৎপাদনগত বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। এসব মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য যতো ভাল বোঝা যাবে, সেই মাটিতে কৃষি উৎপাদনে ততো উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মৃত্তিকার গ্রাহ্য অবক্ষয় না ঘটিয়ে তা কৃষি কাজে ব্যবহার করা যাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ

সারা বিশ্বের মৃত্তিকা বৈচিত্র্য ও উদ্ভিদ আচ্ছাদনের বিভিন্নতা সাধারণভাবে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত হলেও স্থানবিশেষে মৃত্তিকার গুণাবলী ও উদ্ভিদ আচ্ছাদনে সাদৃশ্যও রয়েছে। এ ধরনের সাদৃশ্য বা পার্থক্যের ভিত্তিতে মাটিকে ধারাবাহিকভাবে বিভক্ত করাকে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ বলে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও নির্দিষ্ট ধর্মাবলীর ভিত্তিতে মাটিকে ধারাবাহিকভাবে এক বা একাধিক স্তর বা শ্রেণীতে বিন্যাস করাকে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ বলে।

১। মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের ঐতিহাসিক বিবরণ

মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভি. ভি. ডকুচেভ (V.V. Dokuchaev) ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত–এই ১৪ বছর পর্যবেক্ষণ করে সর্বপ্রথম রাশিয়ান ভাষায় মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের গুরুত্ব ও পদ্ধতিসহ একটি শ্রেণীকরণ কাঠামো প্রণয়ন করেন। কৃষি উৎপাদনের মৃত্তিকার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় জার্মান বিজ্ঞানী কে. ডি. গ্লিঙ্কা (K.D. Glinka) এবং যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞানী সি. এফ. মারবুটসহ (C. F Marbut) অনেক দেশ ও বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে সুনিষ্টভাবে মনোযোগ দেন। শ্রেণীকরণ ধারণাগুলো ভাষান্তর হয়ে হয়ে বিজ্ঞানী সমাজে আলোচিত হতে থাকে। প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও তথ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মারবুট ১৮২৮ সনে একটি শ্রেণীকরণ কাঠামো প্রকাশ করেন। মারবুট পদ্ধতিতে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের মূল ভিত্তি ছিল যে, প্রতি প্রকার মৃত্তিকার বহিরাবয়ব ও ধর্ম সরাসরি মৃত্তিকা উৎপন্নের প্রক্রিয়া এবং উপাদানের সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হয়।

উল্লেখ্যে, মারবুট দর্শনে রয়েছে মৃত্তিকা উৎপন্নের প্রক্রিয়া এবং ডকুচেভ দর্শন রয়েছে মৃত্তিকা উৎপন্নকারী হিসেবে জলবায়ুর প্রাধন্য।

ডকুচেভ মাটিকে প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের জন্য মাটি উৎপাদনকারী শক্তি হিসেবে জলবায়ুর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে থর্প ও স্মিথ (Thorp and Smith) কর্তৃক নিরীক্ষিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বিভাগ (USDA) বর্ষপঞ্জিতে প্রকাশিত হওয়ার পর মারবুট পদ্ধতি ১৯৪৯ সন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সমৃদ্ধশালী হতে থাকে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তবে এই কাঠামো ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দেওয়ায় মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে বিকল্প চিন্তা ধারণা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়। এর ফলস্বরূপ USDA টেক্সনমিক পদ্ধতি নামে একটি শ্রেণীকরণ হসড়া ১৯৬৫ সনে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে এই টেক্সোনমিক পদ্ধতির বেশ প্রসার হচ্ছে।

টেক্সোনমিক পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

বিশ্ব মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে মারবুট ও অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণের সময়ে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। তাই মৃত্তিকা শ্রেণীকরণকে অধিক কর্মক্ষম করার জন্য অসুবিধা এড়িয়ে টেক্সোনমিক পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়। নিচে টেক্সোনমিক পদ্ধতির কয়েকটি সুবিধা উল্লেখ করা হলো —

১. মাটির উৎপাদন ক্ষমতা জানা যায় : মাটির গঠন প্রক্রিয়ার চেয়ে সরাসরি মাটিকে উপস্থিত গুণাবলী বা পরিস্থিতির ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয় বলে এই শ্রেণীকরণ থেকে মাটির উৎপাদিকা শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

২. মাটির ধর্ম সম্পর্কে ধারণা থাকলেই চলে : মাটির প্রধান মৌলিক ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয় বলে ধর্ম সম্পর্কে ধারণা থাকলেই চলে।

৩. কৃষি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা জানা যায় : এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকৃত ও নামকরণকৃত মাটিতে উপস্থিত এবং কৃষি ব্যবহারজনিত সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায় বলে এর কার্যকারিতা বেশি।

৪. বৈজ্ঞানিক তথ্যগত সমতা (Uniformity) থাকে : বিভিন্ন বিজ্ঞানী শ্রেণীকরণ করলেও এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যগত সমতা রাখা সম্ভব। মৃত্তিকা উৎপত্তি জনিত বিশ্লেষণে মতানৈক্য এই পদ্ধতিতে তেমন প্রভাব বিস্তার করে না।

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে অনেকগুলো সুবিধা থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এই পদ্ধতি বর্তমানে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও সার্বজনীন নয়। কয়েকটি অসুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

১. মৃত্তিকা উৎপন্নের প্রক্রিয়া জানা যায় না : মৃত্তিকা উৎপন্নের প্রক্রিয়াসমূহকে বেশ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে এসব প্রক্রিয়া সঠিকভাবে জানা যায় না।

২. মৃত্তিকা ধর্ম ও গুণাবলী পরিবর্তিত হতে পারে : এই পদ্ধতিতে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারিত মৃত্তিকা গুণাবলীসমূহ সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হতে পারে।

৩. নামকরণ বেশ জটিল : নামকরণে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনেক জটিল ও কঠিন মনে হয়।

৪. মৃত্তিকা ধাপের পরিবর্তন হতে পারে : মৃত্তিকা বর্গ বা উপবর্গ অন্যান্য ধাপে সময়ের ব্যবধানে বা অন্য কোনো কারণে অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

৫. নিম্ন পর্যায়ে শ্রেণীকরণ জটিল : এর নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণীকরণ খুবই তথ্যসাপেক্ষ ও জটিল।

৬. স্তর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট নয় : বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তরগুলির (Diagonistic hoirzon) সংজ্ঞা ততোটা সুনির্দিষ্ট নয়। যেমন–আরজিলিক স্তর ও ক্যাম্বিক স্তরের বৈশিষ্ট্যসমূহ বেশ প্রশস্ত মনে হয়।

৭. উপস্থিত দ্রব্যের পরিমাণ মাত্রা ধরা হয়নি : অনেক ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্যের কেবল উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এর ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে যা সঠিক হয় না।

৮. ইন্টারগ্রেড নেই : স্তর ইন্টারগ্রেড (Intergrade) প্রকাশের কোনো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি নেই।

২। টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকা বর্গ ও উপবর্গ

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে শ্রেণীকৃত বর্গের বিবরণ : টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে সারা বিশ্বের মাটিকে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য এ পর্যন্ত ১১ টি বর্গ স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে এন্ড্রোসল নামে ১১ তম বর্গের মাটি প্রধানত জাপানে বেশি রয়েছে, তবে ১০ টি বর্গের মাটি সারা বিশ্বেই রয়েছে। এই ১১ টি বর্গের নাম এখানে দেয়া হলো। প্রতিটি নামের পাশে প্রধান ২ থেকে ৩টি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। এসব বর্গের বিস্তারিত কৃষি উপযোগিতা জানতে হলে এদের অধীন উপবর্গ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। বাংলাদেশের এই ১০ ধরনের মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এন্টিসল ও ইনসেপ্টিসল বর্গের মাটি বেশি।

১. এন্টিসল (Entisol) : অপরিণত মাটি। গঠনজনিত স্তর বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট, স্তর আছে।

২. ভার্টিসল (Vertisol) : সম্প্রসারণশীল কর্দম বেশি থাকায় প্রসার- সংকোচন বেশি। উৎসশিলা প্রধানত চুনাপাথর, মার্ল-বেসল্ট।

৩. ইনসেপ্টিসল (Inseptisol) : অপরিণত, তবে এন্টিসলের চেয়ে উন্নত।

৪. আলফিসল (Alfisol) : ক্ষারক সম্পৃক্তি বেশি। আরজিলিক (Argillic) স্তর আছে।

৫. এরিডিসল (Aridisol) : শুষ্ক ধরনের মাটি, চোয়ানী কম বা নেই, আর্দ্রতা, কম, স্তর চুন্বিত হয়েছে, স্তর বিন্যাস আছে।

৬. হিস্টোসল (Histosol) : জৈবিক মাটি, উপরের স্তরে জৈব কার্বন ১২% কর্দম কণা কম।

৭. মলিসল (Mollisol) : তৃণভূমি, যথেষ্ট জৈব পদার্থ রয়েছে, বর্ণ গাঢ়, মলিক উপর স্তর আছে।

৮. স্পোডোসল (Spodisol) : আর্দ্র মাটি। এলবিক স্তর আছে।

৯. আল্টিসল (Ultisol) : আর্দ্র এলাকায় উৎস, ক্ষারক সম্পৃক্তি কম।

১০. অক্সিসল (Oxisal) : ক্ষয়ীভূত মাটি, অক্সিক উপর স্তর আছে।

১১. এন্ডিসল (Andisol) : আগ্নেয় ছাই মাটি, বর্ণ কালো।

বর্তমানে অধিক জনপ্রিয় টেক্সোনমিক মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ পদ্ধতি জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বে সারা বিশ্বে মারবুট পদ্ধতির শ্রেণীকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মারবুট পদ্ধতিতে সারা বিশ্বের মাটিকে কেবল ৩টি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছিল। এখানে এই ৩টি প্রধান বর্গের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

মারবুট পদ্ধতির শ্রেণীকরণ মারবুট (১৯২৮) তিনটি প্রধান বর্গ

১. **বলয়িত** (Zonal) : মৃত্তিকা উৎপন্ন সক্রিয় উপাদান যথা— জলবায়ু, জীবকার্য, বিশ্লেষণ করে উদ্ভিদ আচ্ছাদনের প্রভাব প্রতিফলনশীল উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাটি (পডজল, লেটোরাইট)।

২. অবলয়িত (Intrazonal) : মাটি জলবায়ু ও উদ্ভিদ আচ্ছাদনের প্রভাবসহ অন্যান্য স্থানীয় উপাদান যেমন — নিকাশ, উৎস দ্রব্য এবং সময়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে পৃষ্ঠ মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মাটি (ক্লে মাটি ও বর্গ মাটি)।

৩. অবলিয়ত (Azonal) : যেমন— পলিমাটি যে ক্ষেত্রে মৃত্তিকা উৎপন্নজনিত কোনো স্তর নেই, তাকে অবলয়িত মাটি বলে।

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকা বর্গকে এদের বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে ক্রমশ ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়েছে কোনো এলাকার মৃত্তিকা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে মৃত্তিকা বর্গ পুনঃশ্রেণীকরণের বিষয়গুলো জানতে হবে তাই বিষয়টি নিচে আলোচনা করা হলো।

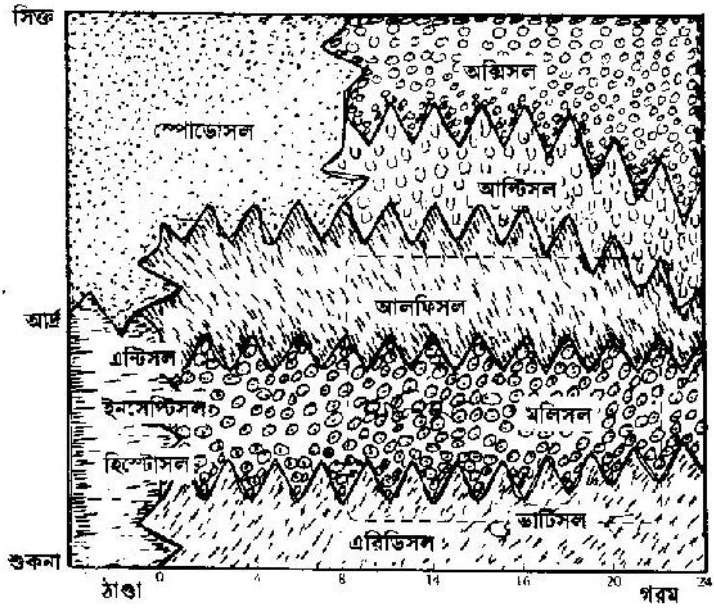

চিত্র ১৭ : জলবায়ু ও মৃত্তিকা শ্রেণীকরণ

BANSDOC Library

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে মাটিকে মোট ৭টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে, যেমন —

ধাপ ১. বর্গ (Order) : মৃত্তিকা পার্শ্বচিত্রের স্তর বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

ধাপ ২. উপবর্গ (Sub-order) : প্রধানত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পার্থক্যের ভিত্তিতে।

ধাপ ৩. বৃহৎ শাখা (Great group) : স্তরের বিভিন্নতা (কর্দম, লৌহস্তর অনুসারে)।

ধাপ ৪. উপশাখা (Sub-group) : মৃত্তিকা গুণাবলীর বিভিন্নতা মাত্রা অনুসারে।

ধাপ ৫. গোত্র (Family) : মৃত্তিকার মৌলিক ধর্মের ভিত্তিতে।

ধাপ ৬. সিরিজ বা ক্রম (Series) : সহজে দর্শনযোগ্য/পরিমাপযোগ্য ধর্মের ভিত্তিতে (নামকরণ স্থান, নদীর নাম, শহরের নাম দেওয়া)।

ধাপ ৭. ফেজ বা পর্যায় (Phase) : মাটির উপরের স্তরের বুনট, ঢাল/ লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়ের ভিত্তিতে।

সাধারণ নামের সাথে টেক্সোনমিক নামের সম্পর্ক

মাটির কতকগুলো সাধারণ নাম বা প্রচলিত নাম ও পূর্বে শ্রেণীকৃত পদ্ধতির কিছু নামের সাথে টেক্সোনমিক পদ্ধতির নামে সাযুজ্য দেখানো হলো—

পলি মাটি :	এন্টিসল, ইনসেপ্টিসল, আলফিসল ;
লাল মাটি :	আলফিসল, ইনসেপ্টিসল আল্টিসল ;
লেটারাইট মাটি :	আলফিসল, আল্টিসল, অক্সিসল ;
মরু মাটি :	অক্সিসল, এন্টিসল, এরিডিসল ;
কৃষ্ণ মাটি :	ভার্টিসল, ইনসেপ্টিসল, এন্টিসল, মলিসল, স্পোডোসল, হিস্টোসল।

মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি বর্গকে কয়েকটি উপবর্গে ভাগ করা হয়েছে। বর্গকে উপবর্গের ভাগ করার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে দুটি ; যথা — (১) আর্দ্রতা — কম বা বেশি এবং (২) তাপ — কম বা বেশি

টেক্সোনমিক পদ্ধতির বিভিন্ন উপবর্গের নাম উল্লেখ করা হলো

১. এন্টিসল : একুয়েন্ট, এরেন্ট, ফ্লুভেন্ট, অর্থেন্ট, সেমেন্ট (৫)

২. ভার্টিসল : টরার্ট, উডার্ট, উস্টার্ট, জেরার্ট (৪)

৩. ইনসেপ্টিসল : এনডেপ্ট, একুয়েপ্ট, অক্রেপ্ট, ট্রোপেপ্ট, প্লেগেপ্ট আমব্রেপ্ট (৬)

৪. আলফিসল : একুয়ালফ, বোরালফ, উডালফ, উস্টালফ, জেরালফ (৫)

৫. এরিডিসল : এরজিডস, এরথিডস (২)

৬. হিস্টোসল : ফাইব্রিস্ট, ফলিস্ট, হেমিস্ট, সেপ্রিস্ট (৪)

৭. মলিসল : এলবল, বোরোল, রেন্ডোল, উডল, উস্টল, জেরোল (৬)

৮. স্পোডোসল : একুওড, ফেরোড, হিউমড, অর্থোড (৪)

৯. আল্টিসল : একুয়াল্ট, হিউমাল্ট, উডাল্ট, উস্টাল্ট জেরাল্ট (৫)

১০. অক্সিসল : একুওক্স, উডক্স, পেরেক্স টরোক্স (৫)

১১. এন্ডিসল : একুয়ান্ড, ক্রায়ান্ড, টোরান্ড, উডান্ড, উস্টান্ড, জেবান্ড, ভিট্রান্ড (৭)

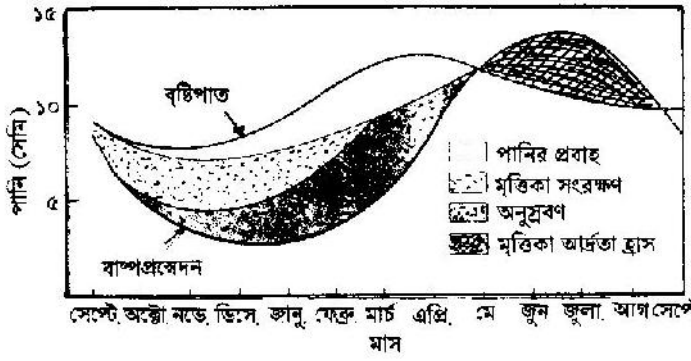

চিত্র ১৮ : মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে ঔডিক আর্দ্রতার বৈশিষ্ট্য

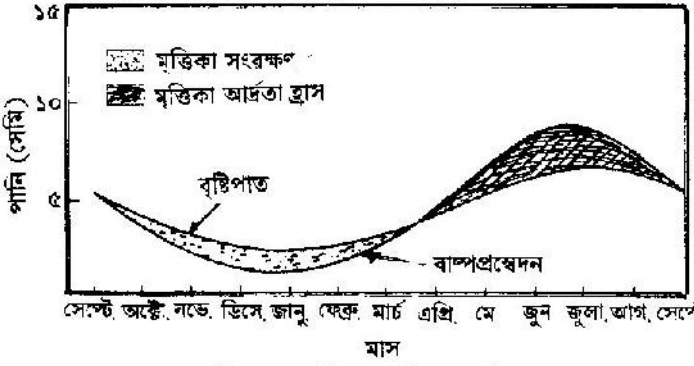

চিত্র ১৯ : শ্রেণীকরণে উস্টিক আর্দ্রতা

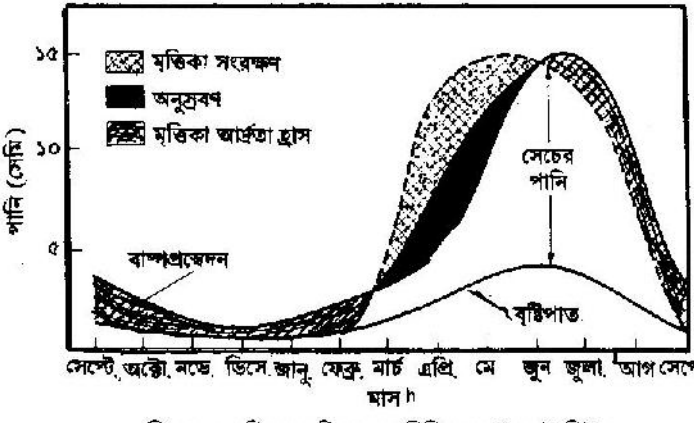

চিত্র ২০ : মৃত্তিকা শ্রেণীকরণে এরিডিক আর্দ্রতার বৈশিষ্ট্য

সারণি ৪ : বিশ্বে বিভিন্ন মৃত্তিকা বর্গের অধীন জমির পরিমাণ

ক	বর্গ	জমি (০০০বর্গ কি.মি.)
	এরিডিসল	২৫৬৪০ (১৯.৩%)
	ইনসেপ্টিসল	২০৯৫ (১৫.৯%)
	আলফিসল	১৯৬৮৪ (১৪.৮%)
	এন্টিসল	১৬৮৩৫ (১২.৭%)
	অক্সিসল	১২৪৩২ (৯.৪%)
খ	মলিসল	১১৯৪ (৮.৯%)
	আল্টিসল	১১৩৯৬ (৮.৬%)
	স্পোডোসল	৬২১৬ (৪.৭%)
	আলফিসল	২৮৪৯ (২.২%)
	হিস্টোসল	১০৩৬ (০.৮%)
গ	বরফ ও বন্ধুর পর্বত	৩১০৮ (২.৩%)
ঘ	অশ্রেণীভুক্ত দ্বীপাঞ্চল	৫২৮ (০.৪%)
	সর্বমোট	১৩৩০১৫ (১০০.০%)

উৎস : ডনাহু (১৯৭৭) ও ব্রেডি (১৯৭৪) এবং অন্যান্য উৎস থেকে অভিযোজিত।

বর্তমানে পতিত অথচ প্রচ্ছন্ন চাষযোগ্য (Petentially arable) জমির মহাদেশীয় হিসাব নিম্নরূপ –

স্থান	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)
দক্ষিণ অমেরিক	৬০৭.৫
এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড— প্রতিটি	২৪৩.০
আফ্রিকা	৫৬৭.০
উত্তর আমেরিকা	২৪৩.০
ইউরোপ	৪০.৫

উৎস : M.Keyfitz (1969) US and world Population. In Wesoures and Man. NAS. & NRC.

সারণি ৫ : উচ্চ উর্বরতাসম্পন্ন মৃত্তিকা উপবর্গের বিবরণ

মৃত্তিকা বর্গের নাম আয়তন	উপবর্গের নাম	প্রধান ব্যবহার	মন্তব্য
মলিসল	একুওল	ফসল জমি	উর্বর
৮.৬%	বারোল	ফসল জমি	কৃষি
	উডল	ফসল জমি	জমি
	উস্টল	ফসল জমি, তৃণ ভূমি	
	জেরোল	ফসল জমি, তৃণ ভূমি	
আলফিসল	একুয়ালফ	ফসল জমি	লোহা ও
১৩.২%	বোরালফ	বন	এলুমিনিয়াম
	উডালফ	ফসল জমি	কিছুটা বেশি
	উস্টালফ	ফসল জমি	
	জেরালফ	তৃণ ভূমি	
ভার্টিসল ১.৮%	উডার্ট	ফসল জমি	উর্বর জমি,
	উস্টার্ট	ফসল জমি	মাটি ফেটে যায়

সারণি ৬ : মধ্যম উর্বরতাসম্পন্ন মৃত্তিকা উপবর্গের বিবরণ

মৃত্তিকা বর্গের নাম ও আয়তন	উপবর্গের নাম	প্রধান ব্যবহার	মন্তব্য
এন্টিসল	একুয়েন্ট অরথেন্ট	নিচু জমি	বাহিত
৮.৩%		তৃণ ভূমি, বন	মাটি
হিস্টোসল	প্রায় সকল	নিচু জমি,	পিট
০.৯%		ফসল জমি	
ইনসেপ্টিসল	একুয়েপ্ট	ফসল জমি	নবীন
৮.৯%	অক্রেপ্ট	ফসল জমি, বন	মাটি
এন্ডিসল	এন্ডিসল	ফসল জমি, বন	কালো মাটি

সারণি ৭ : নিম্ন উর্বরতাসম্পন্ন মৃত্তিক উপবর্গের বিবরণ

মৃত্তিকা বর্গের নাম ও আয়তন	উপবর্গের নাম	প্রধান ব্যবহার	মন্তব্য
এরিডিসল ১৮.৮%	এরজিড আর্থিড	তৃণ ভূমি তৃণ ভূমি	শুষ্ক এলাকা
এন্টিসল ৮.৩%	সেমেন্ট	ফসল জমি	বেলে মাটি
ইনসেপ্টিসল ৮.৯%	আমব্রেপ্ট	বন	নিকাশ ভাল
স্পোডোসল ৪.৩%	একুওড অর্থড	বন বন	ধূসর বর্ণ
আল্টিসল ৫.৬%	একুয়াল্ট হিউমাল্ট টেডাল্ট	বন বন বন, ফসল জমি	পুরাতন মাটি
অক্সিসল ৮.৯%	প্রায় সকল	ফসল জমি, বন	লালচে মাটি

তথ্য সূত্র : USDA, 1985

৩। মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী ও নামাংশ

উপবর্গের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক বর্গের মৃত্তিক স্তর বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার ভিত্তিতে উপবর্গে ভাগ করা হয়। স্তর বর্ণ, আর্দ্রতা, তাপ, উৎস দ্রব্য, জৈব পদার্থ, খনিজ সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশকারী শব্দ বর্গের নামের সাথে যুক্ত করে উপবর্গের নামকরণ করা হয়। যেমন

এলবল : এলবিক স্তর সম্পন্ন মলিসল,

অক্রেপ্ট : হালকাবর্ণ সম্পন্ন ইনসেপ্টিসল, একুয়েপ্ট–আর্দ্র এন্টিসল,

বোরলফ : হিম এলাকার আলফিসল,

রেন্ডোল : চুনা উৎস দ্রব্যের মলিসল,

হিউমড : জৈব পদার্থসম্পন্ন স্পোডোসল,

সেমেন্ট : বালিপ্রধান এন্টিসল, ইত্যাদি। মৃত্তিকা স্তরসম্পন্ন শব্দাবলীর বর্ণনা পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে

মৃত্তিকা বৃহৎ শাখার বৈশিষ্ট্য

মৃত্তিকা বর্গ পৃথকীকরণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে প্রতিটি উপবর্গকে বৃহৎ শাখায় বিভক্তির ভিত্তি ও ধর্ম-গুণাবলী উল্লেখ করা হলো—

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর

ইপিপেডন বা উপর স্তর

১. হিস্টিক (Histic) : প্রায় ৩০ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত জৈব মাটি প্রায় ২৫% প্রধানত পানি সম্পৃক্ত।

২. মলিক (Mollic) : যথেষ্ট জৈব পদার্থ (৩০৫%), আর্দ্র, মৃত্তিকা বর্ণের ভেলু ৩.৫। এই স্তরের গভীরতা প্রায় ২০ সেমি।

৩. অক্রিক (Ochric) : হালকা বা ময়লা বর্ণ স্তর, জৈব পদার্থ কম।

৪. আম্বিক (Umbic) : মলিকের অনুরূপ, তবে অম্লত্ব বেশি।

এন্ডোপেডন বা নিম্নস্তর

১. এলবিক (Albic) : সাদাটে স্তর কর্দম কণা ও লৌহ অক্সাইড চুয়ানীর ফলে সৃষ্ট প্রধানত পলি ও সূক্ষ্ম বালি সমন্বয়ে উৎপন্ন।

২. আরজিলিক (Argilic) : কর্দম কণা বেশি, কর্দম আবরণ থাকে।

৩. নেট্রিক (Natric) : লবণাক্ত স্তর সোডিয়ম ১৫% কর্দম বেশি কিন্তু সংযুতি স্তম্ভাকার বা প্রিজমেটিক।

৪. অক্সিক (Oxic) : জারিত স্তর, লোহা ও এলুমিনিয়াম আছে।

৫. স্পোডিক (Spodic) : ধূসর স্তর। স্তরে হিউমাস বা সেস্কুই-অক্সাইড জমা হয়।

৬. কেলসিক (Calcic) : চুনা স্তর উপর স্তরের চেয়ে নিম্ন স্তরে কেলসিয়াম কার্বনেটের অন্তত ৫% বেশি ১৫ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ প্রায় ১৫%।

উপশাখার বৈশিষ্ট্য প্রধানত তিন ধরনের

প্রথমত, বৃহৎ শাখার মূল গুণাবলী সম্পন্ন টাইপিক (Typic);

দ্বিতীয়ত, অন্য বৃহৎ শাখার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার উপযোগী গুণাবলী বিদ্যমান;

তৃতীয়ত, টাইপিক বা অন্য ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য : শ্রেণীকরণ ভিত্তি হচ্ছে —

(ক) উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী, যথা : বুনট, অম্লমান, ভেদ্যতা, সংযুতি, গভীরতা, দৃঢ়তা।

(খ) প্রকৌশলী কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যথা : বুনট, খনিজ দ্রব্য, স্তর গভীরতা, দৃঢ়তা।

অন্যান্য ধাপের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক পরিবারের অধীন ক্রম বা সিরিজের নামের সাথে মাটির উৎপত্তিগত সম্পর্ক থাকার নিশ্চয়তা নেই। এলাকা, নদী-নালা বা শহরের নামের সাথেও সিরিজের নামকরণ করা হয়। ভিত্তি গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে বর্ণ, বুনট, সংযুক্তি, গভীরতা ও দৃঢ়তা। মাটির উপরের স্তরের বুনট ঢাল (%) ধনাত্মক আয়ন ও লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা, ইত্যাদির ভিত্তিতে ফেজ এর নামকরণ করা হয়।

মৃত্তিকা চিত্রায়ন একক (Soil mapping unit)

মৃত্তিকা মানচিত্র তৈরি করার সময় সিরিজ ও পর্যায়ের নাম এক সাথে ব্যবহার করা হলে তাকে মৃত্তিকা চিত্রায়ন একক বলে। মৃত্তিকা শ্রেণীকরণের ভাষায় সকল চিত্রায়ন একককে পলিপেডন (Polypedon) বলে। পূর্বে ফেজ বা পর্যায়কে মাটির টাইপ (Soil type) বলা হতো।

মাটির আর্দ্রতা সংক্রান্ত শব্দাবলীর অর্থ

১. একুইক (Aquic) : ৫০ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত তাপ ৫° সেঃ এবং অধিকাংশ সময়ে মাটি পানি সম্পৃক্ত থাকে।
২. উডিক (Udic) : গ্রীষ্মকালে ফসল বৃদ্ধির এক বা অর্ধ-ঋতুর প্রয়োজনীয় পানি অবশিষ্ট থাকে।
৩. এরিডিক (Aridic) : তাপ কিছুটা বেশি ফসল বৃদ্ধির এক বা অর্ধ-ঋতুর প্রয়োজনীয় পানি অবশিষ্ট থাকে।
৪. উস্টিক (Ustic): তাপ উদ্ভিদ বৃদ্ধির অনুকূল থাকাবস্থায় (১৫ থেকে ৩০° সেঃ) আর্দ্রতা সরবরাহজনিত সীমাবদ্ধতা (স্বল্পতা) দেখা দেয়।
৫. জেরিক (Xeric) : শীতকালে আর্দ্রতা থাকে তবে ফসল জন্মানো যায় না, কিন্তু উষ্ণ ঋতুতে তাপ অনুকূলে তবে আর্দ্রতা ঘাটতি থাকে।

সংক্ষেপে

৫০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত : এই সময়ে পানি সম্পৃক্ত	একুইক।
তাপমাত্রা ৫ সে. এর বেশি : কেবল গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট আর্দ্রতা থাকে	উডিক।
কেবল এক বা অর্ধ ফসল ঋতু পানি থাকে	এরিডিক।
তাপ উদ্ভিদ বৃদ্ধির অনুকূলে থাকা অবস্থায় : পানির স্বল্পতা	উস্টিক।
পানির ঘাটতি	জেরিক।

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে ব্যবহৃত নামাংশ

টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে মৃত্তিকা বর্গ, উপবর্গ, বৃহৎ শাখা ও উপশাখার নামকরণের সময় নামের পূর্বে (Prefix) বা পিছনে (Postfix) কতিপয় শব্দ যোগ হয়। এ সকল শব্দ ল্যাটিন বা গ্রিক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে।

ল্যাটিন	অর্থ
Albus/Alb	সাদা
Arena	বালি
Argilla/Arg	সাদা কর্দম
Calcio/Calc	চুন
Cambire/Camb	বিনিময়
Cumulus	স্তূপানো
Durus/Dur	শক্ত
Fluvus/Fluv	নদী
Fragilis/Frag	ভঙ্গুর
Ruptum	ভাঙ্গা
Terra	পৃথিবী
Torridus/Torr	উত্তপ্ত শুকনো
Udus/Ud	আর্দ্রতা
Umbral Umbr	ছায়া
Ustus/Ust	পুড়ানো
Veumes/Verm	ক্রিমি
Vitrum/Vitr	কাঁচ
গ্রিক	**অর্থ**
Acr	সমাপ্তি
Arios	বায়ু
Bor	উত্তরাঞ্চলীয়
Chroma	বর্ণ
Kryos/Cry	বরফঠাণ্ডা
Epi	উপরে
Dystr	অনুর্বর
Hals	লোনা
Haplous/Hapl	সরল সহজ
Hydor/hydr	পানি
Lithios	পাথুরে
Ochros/Ochr	ময়লা/হালকা
Pachys	স্থূল মোটা
Petra	শিলা
Paleos/Pal	পুরাতন
Plinthos/Plinth	ইঁট
Psammos	বালি

গ্রিক	অর্থ
Rhodon	গোলাপ
Rhod	মাটির নিচে ফেলা
Xer	শুকনো

অন্যান্য ভাষা থেকে নেয়া	অর্থ
Ando	কালো
Aqu	পানি
Plag	সঙ বা জৈব দ্রব্য
Hemi	অর্ধ
Histos	অংশীয় জৈবদ্রব্য
Anthro	চাষসিক্ত
Moll	নরম স্তর
Tropi	উষ্ণ
Sapr	বিয়োজিত
Oxic	জারিত

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্তিকা বর্গের বিবরণ

মৃত্তিকা বর্গের বিবরণ : এন্টিসল

অপরিণত বা নবীন মাটি, উৎসগত (genetic) স্তরবিন্যাস নেই স্রোত পার্শ্বস্থানের পলি অবক্ষেপ এবং নদ-নদীর ভূমিক্ষয়শীল খাড়া ঢাল এলাকায় এই মাটি উৎপন্ন হয়। ক্ষয়রোধী উৎস দ্রব্য সম্পন্ন স্থানেও এই মাটি উৎপন্ন হতে পারে। স্বল্প গভীর অক্রিক উপর স্তর বিদ্যমান জৈবপদার্থ কম। উপরে স্তরে কার্বনেট চুয়ানী ঘটতে পারে

উপবর্গ

১. একুয়েন্ট (Aquent) : ঋতুভিত্তিক পানি সম্পৃক্ত, ঢাল মধ্যম।
২. এরেন্ট (Arent) : লাঙ্গল স্তর চাষ কার্যের ফলে নিম্নস্তরের সাথে মিশ্রিত।
৩. ফ্লুভেন্ট (Fluvent) : অববাহিকা এলাকায় প্লাবন স্তর বিন্যাস আছে।
৪. সেমেন্ট (Psamment) : অধিক বালি কণা রয়েছে।
৫. অরথেন্ট (Orthent) : এন্টিসলের ঘনিষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন বা টাইপিক। বালি কণা কম বুনট দো-আঁশ শ্রেণীর নিকাশ উত্তম, বন্যাস্তর নেই ও চাষসংক্রান্ত কার্যাবলী সৃষ্টি স্তর নেই ঢাল মধ্যম থেকে খাড়া।

এন্টিসলের বিস্তৃতি : সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মূল ভূমির প্রায় ৮% এলাকা এন্টিসল। এর মধ্যে রয়েছে পূর্বশ্রেণীকৃত অবলম্বিত ও নিম্ন হিউমিক গ্লে মাটি। মধ্যম উর্বর অগ্নেয় ছাই (Volcanic ash) যুক্তরাষ্ট্রের স্বল্পগভীর পূর্ব পর্বত মাটি। সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য অস্ট্রেলিয়া, আরব, আলাস্কা, সাইবেরিয়া ও তিব্বতে এই মাটি পাওয়া যায়। অবশ্য উৎস দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের উপর এর উর্বরতা নির্ভর করে।

স্তর বিন্যাস না হওয়ার কারণ ও সীমাবদ্ধতা

১. উৎস দ্রব্য ক্ষয়রোধী (যেমন-কোয়ার্জ)।
২. ক্ষয় দ্রব্য দ্রবীভূত হয়ে যায় (যেমন-চুনাপাথর)।
৩. বয়স কম (যেমন-পলিমাটি)।
৪. প্রতিকূল পরিবেশ (যেমন- খুব বেশি ঠাণ্ডা বা উষ্ণ)।
৫. খাড়া ঢাল (নদ-নদীর তীর বা পাহাড় পর্বত) ক্ষয় দ্রব্য অপচয় বেশি।

সীমাবদ্ধতা

১. উপর স্তরের গভীরতা কম ;
২. কর্দম খনিজ (কলোয়েড) কম ;
৩. বিষম পরিবেশ, শুষ্ক বা জলাবদ্ধতা ;
৪. ঢাল ও ভূমিক্ষয় বেশি।

বাংলাদেশের এন্টিসল মাটির বৈশিষ্ট্য

১. মাটির সংযুক্তি ও গঠন দুর্বল ;

২. কেবল অক্সিক, এলবিক ও অগ্নিক স্তরের উপস্থিতি ;

৩. ২৫–১০০ সেমি. গভীরতার মৃত্তিকা বুনট স্থূল (দো-আঁশ বালি ধরনের যেমন— চুনযুক্ত ও চুনহীন পলিমাটি–টাইপিক ও এরিক ফ্লুবাকুয়েন্ট।

অম্লসালফেট মাটি : নতুন জেগে উঠা অপরিক্ব অংশ।

অম্ল বিল কর্দম : (অনিষ্কাশিত অংশ) ও ধূসর পলিমাটি (নতুন চরাভূমি)।

বর্গ : ইনসেপ্টিসল

ঈষৎ উন্নয়ন প্রাপ্ত (এন্টিসলের চেয়ে বেশি উন্নত)। অক্রিক ও আম্বিক উপর স্তর। কেম্বিক নিম্নস্তর এবং ফ্রেজিপেন (Fragipan) ও ডুরিপেনের (Duripan) উপস্থিতি রয়েছে। মল্লিক স্তরের অনুরূপ আম্বিক স্তর গভীর ও গাঢ়, তবে ক্ষারক সম্পৃক্তি ৫০% অর্থাৎ বিক্রিয়া অম্লভাবাপন্ন। ইনসেপ্টিসল পরিণত না হওয়ার কারণ অনেকটা এন্টিসলের অনুরূপ যেমন — বয়স কম, উৎস দ্রব্য ক্ষয়রোধী, ভূমিক্ষয় হার বেশি, সিক্ত ও ঠাণ্ডা পরিবেশ।

উপবর্গ (ক) একুয়েপ্ট (Aquept) : নিকাশ প্রধানত অসম্পূর্ণ। আমাজান ও গঙ্গা নদীসমূহের তীরে পাওয়া যায়।

১. **এন্ড্রেপ্ট** (Andept) : আগ্নেয় ছাই বেশি। কর্দম অদানাদার পুমিস বেশি। ঢাল মধ্যম থেকে খাড়া, মাটি প্রধানত অরণ্যাবৃত

২. **একুয়েপ্ট** (Aquept) : সিক্ত ভূমি, অস্থায়ী জলাবদ্ধ, পুরাতন পলি।

৩. **অক্রেপ্ট** (Ochrept) : বর্ণ হালকা : B-স্তরে কর্দম সঞ্চিত হতে পারে।

৪. **প্লেগেপ্ট** (Plaggept) : অন্তত ৫০ সেমি. গভীরতা মাটি জৈব পদার্থ প্রয়োগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

৫. **ট্রোপেপ্ট** (Tropept) : উষ্ণমণ্ডলীয়, উত্তাপ বেশি, ক্ষয়রোধী উৎস দ্রব্য বেশি।

৬. **আম্ব্রেপ্ট** (Umbrept) : বর্ণ গাঢ়, অম্লীয় জৈব পদার্থ একটু বেশি।

এন্টিসল ও ইনসেপ্টিসলে পার্থক্য

এন্টিসল	ইনসেপ্টিসল
১. মাটির গঠন ও উন্নয়ন খুবই কম	১. উন্নয়ন কম তবে এন্টিসলের চেয়ে বেশি।
২. আম্বিক উপর স্তর নেই	২. আম্বিক উপর স্তর থাকতে পারে।
৩. কেম্বিক নিম্নস্তর নেই।	৩. কেম্বিক নিম্নস্তর থাকতে পরে।
৪. মাটির বয়স কম।	৪. মাটির বয়স বেশিও হতে পারে

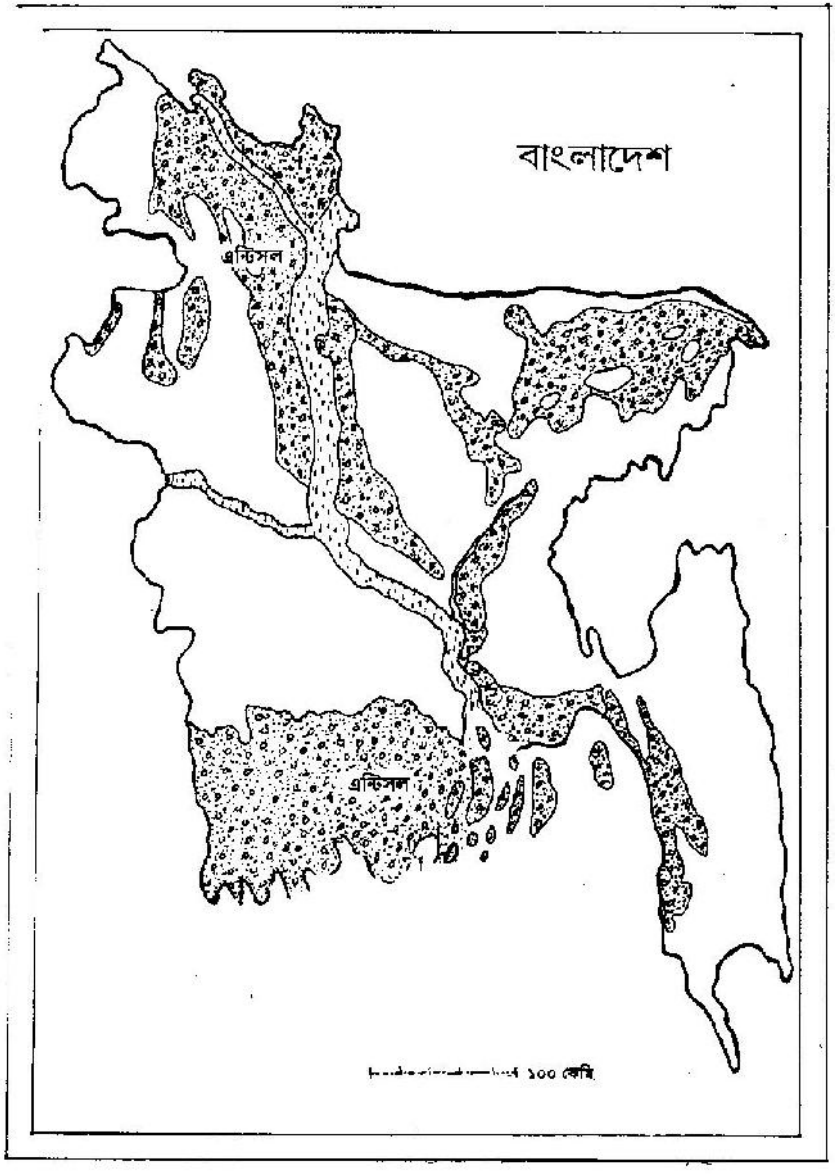

চিত্র ২১ : বাংলাদেশের একক ও মিশ্র প্রধান প্রধান এন্টিসল মাটির এলাকা.

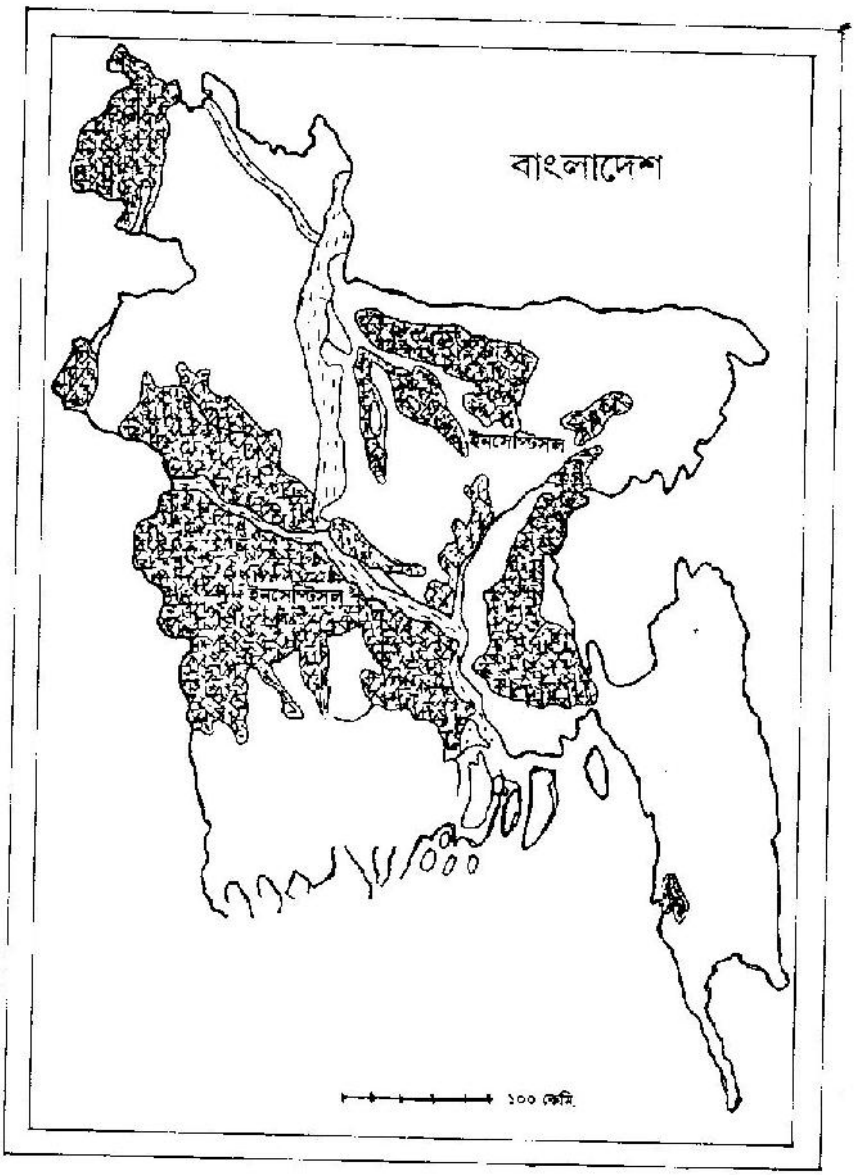

চিত্র ২২ : বাংলাদেশের একক ও মিশ্র প্রধান প্রধান ইনসেপ্টিসল মাটির এলাকা

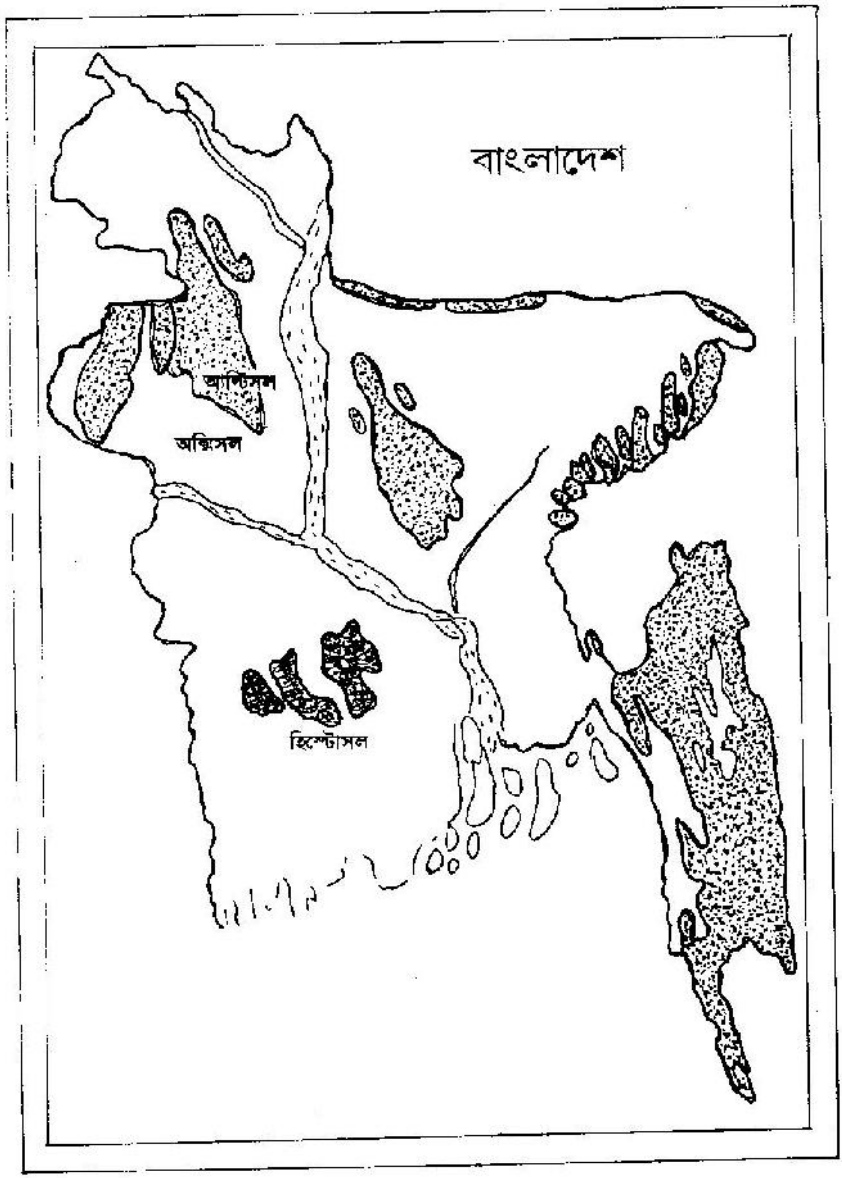

চিত্র ২৩ : বাংলাদেশের একক ও মিশ্রভাবে প্রধান প্রধান হিস্টোসল, আলফিসল, অক্সিসল ও অন্যান্য মাটির এলাকা।

ইনসেপ্টিসলের বিস্তৃতি ও সীমাবদ্ধতা

এই মাটির বিস্তৃতি বেশ ব্যাপক। হিম (Arctic) অঞ্চল থেকে উষ্ণ অঞ্চলেও পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়া, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, বাংলাদেশসহ অনেক স্থানে এই মাটি পাওয়া যায়। পূর্ব শ্রেণীকৃত (১৯৪৯) বাদামি অরণ্য, নিম্ন হিউমিক গ্লে, এন্ডো ও সলসব্রান এসিড (Solsbrun acide) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

১. অসম্পূর্ণ নিকাশ ;
২. মাটির অপরিপূর্ণতা ;
৩. ফ্রেজিপেন ও ডুরিপেন ;

বাংলাদেশের ইনসেপ্টিসল মাটি

বাংলাদেশের ইনসেপ্টিসল মাটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হেপ্লোকুয়েপ্ট অ্যু সালফেট মাটি, ধূসর পলিমাটি, ধূসর পাদভূমি, অম্লবিল কর্দম, গাঢ় ধূসর ও চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর পলি মাটি, ধূসর সোপান মাটি, চুনযুক্ত বাদামি পলি মাটি (অক্রেপ্ট), বাদামি পাহাড়ী মাটি (অক্রেপ্ট), কালো তেরাই মাটি (হেপ্লোমব্রেপ্ট)।

বর্গ : হিস্টোসল

জৈব মাটি, খনিজ কম। জৈব পদার্থের পরিমাণ ১২%। খনিজ ৬০% হলে খনিজ ১৮% পর্যন্ত হতে পারে। মাটি জলাবদ্ধ, অবাত। উপর মৃত্তিকার গভীরতা কম হতে পারে। এই মাটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য —

১. জৈব পদার্থ ১২-২০% ;
২. জলাবদ্ধ অবাত অবস্থায় উৎপন্ন হয় ;
৩. পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি ;
৪. ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশি ;
৫. আয়তনী ঘনত্ব কম ;
৬. পটাসিয়াম ও কপারের বিশেষ ঘাটতি।

এই মাটির পূর্ব নাম বগমাটি (Bog sol)। সকল জলবায়ুতেই এই মাটি পাওয়া যায় তবে আয়তন কম। বিশেষ করে জৈব পদার্থসম্পন্ন জলাবদ্ধ ও নিম্নতাপ সম্পন্ন স্থানে বেশি (আলাস্কা, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড)।

উপবর্গ

১. ফ্লাইব্রিস্ট (Fibrists) : জৈব পদার্থে দ্রব্য বেশি।
২. ফলিস্ট (Follists) : পুনিষ্কাশিত স্থানে উৎপন্ন হয়, কিছু অংশ অরণ্যবৃত।
৩. হেমিস্ট (Hemists) : আঁশীয় দ্রব্য মিশ্রিত থাকে।
৪. সেপ্রিস্ট (Saprists) : উত্তমভাবে বিয়োজিত জৈব দ্রব্য সম্পন্ন।

সারণি ৮ : টেক্সোনমিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মৃত্তিকার প্রধান প্রধান বর্গ, উপবর্গ ও সিরিজের সংখ্যা

বর্গ	উপবর্গ	বৃহৎ শাখা	সিরিজের সংখ্যা
এন্টিসল	একুয়েন্ট	ফ্লুব কুয়েন্ট	৭৫
এন্টিসল	একুয়েন্ট	অন্যান্য	১৭
ইনসেপ্টিসল	একুয়েপ্ট	হেপ্লাকুয়েপ্ট	২৪৫
ইনসেপ্টিসল	একুয়েপ্ট	অন্যান্য	৭৮
অলিটিসল	উডলট	লেপ্‌ডাল্ট	২৫
		মোট	৪৩৮
		অন্যান্য	২৬
		জরিপকৃত সর্বমোট	৪৯৪

হিস্টোসলের সীমাবদ্ধতা

১. অসম্পূর্ণ নিকাশ ;

২. জৈব পদার্থের আঁশভাব ও স্থূলত্ব

বাংলাদেশের হিস্টোসল মাটি

পিট মাটি (গোপালগঞ্জ-খুলনা জলাভূমি)।

বর্গ : মলিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. মলিক উপর স্তরের উপস্থিতি ;

২. উন্নত মৃত্তিকা সংযুক্তি ;

৩. অধিক ক্ষারক সম্পৃক্তি >৫০% ;

৪. ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশি

শুষ্ক ও মরুভূমির সীমান্ত বৃষ্টিপূর্ণ ঘাসী জমি যেখানে ক্ষারকের চুয়ানী কম সেখানে জৈব পদার্থ ও মৃত্তিকার মিশ্রণে দানাদার সংযুক্তি সম্পন্ন গাঢ় বর্ণের মলিসল মাটি উৎপন্ন হয়।

উপবর্গ

১. **এলবল** (Alboll) : এলবিক নিম্নস্তর (A_2) আছে, পানি জমা হাওয়ার সম্ভাবনা আছে ;

২. **বোরল** (Boroll) : হিম অঞ্চলের মলিসল মাটি ;

৩. **রেন্ডোল** (Rendol) : মলিক উপর স্তরের নিচের অংশ ;

৪. উডল (Udoll) : আর্দ্র জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মলিসল মাটি ;

৫. উস্টল : মধ্যম শুষ্ক জলবায়ুর মলিসল মাটি, সারা গ্রীষ্মে একান্তর আর্দ্র-শুষ্ক অবস্থা থাকে।

৬. জেরোল (Xeroll) : শুষ্ক এলাকা।

বাংলাদেশের মলিসল মাটি

বাংলাদেশের মলিসল মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী—

১. মলিক উপর স্তর আছে ;

২. উপরস্তরের গভীরতা ২০ থেকে ২৫ সেমি, বর্ণ গাঢ় ;

৩. ক্ষারক সম্পৃক্তি ৫০%।

মলিসলের বিস্তৃতি

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় ঘাসী এলাকায় মলিসল মাটি বেশি পাওয়া যায়। এর শুষ্ক প্রান্তে এরিডিসল এবং আর্দ্র প্রান্তে রয়েছে আলফিসল ও স্পোডোসল। পৃথিবীর অনেকগুলো মুখ্য কৃষি জমি মলিসল মৃত্তিকা সমন্বয়ে গঠিত। কানাডা থেকে মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিপুল এলাকা জুড়ে মলিসল মাটি রয়েছে।

মলিসলের সীমাবদ্ধতা

এই সীমাবদ্ধতা মোটামুটি কম। সেচ ও কৃত্রিম সার প্রয়োগ দ্বারা সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তি সম্ভব

বাংলাদেশের বিপুল আয়তনের গাঢ় ধূসর পলিমাটি অতীতের গুণাবলী অনুসারে সম্ভবত মলিসল বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যেত। কিন্তু তীব্র চাষাবাদের ফলে উক্ত মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে গেছে। গাঢ় বর্ণ ক্রমে হালকা হয়ে গেছে। পুরাতন মেঘনা মোহনা ভূমি, পলিমাটি ও অনিষ্কাশিত এসিড বেসিন কর্দমে হেপ্লাকুওল (Haplaquoll) বৃহৎ শাখার মাটিতে এখনো কিছু কিছু গুণাবলী অবশিষ্ট রয়েছে।

বর্গ : এরিডিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী —

১. বছরে কমপক্ষে ৬ মাস শুষ্ক থাকে ;

২. বৃষ্টিপাত ও চুয়ানী কম ;

৩. মাটিতে চুনযুক্ত স্তর রয়েছে ;

৪. জিপসাম সঞ্চয়ন হতে পারে ;

৫. জৈব পদার্থ খুবই কম ;

৬. ক্ষারক সম্পৃক্তি কিছুটা বেশি ;

৭. অক্রিক উপর স্তর ও নেট্রিক নিম্নস্তর থাকতে পারে।

উপবর্গ

১. এরজিড (Argid) : আরজিলিক বা নেট্রিক নিম্নস্তর আছে।

২. অরথিড (Orthid) : কর্দম সঞ্চয়ন কিছুটা কম।

এরিডিসলের বিস্তৃতি ও সীমাবদ্ধতা

সারা বিশ্বে এই বর্গের মাটিই আয়তনে বেশি যেমন সাহারা, চীনের গোবি ও টাকলামাকান (Taklamakan) তুর্কিস্থান (Turkistan) এছাড়া অন্যান্য মহাদেশেও প্রচুর এরিডিসল রয়েছে। পূর্বশ্রেণীর মরু মাটি সিরোজেম (Sirrozem) ও সলোন চক এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এরিডিসলের সীমাবদ্ধতা

১. সেচ ও সার প্রয়োজনীয়তা বেশি ;

২. জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘাটতি ;

৩. উত্তাপ বেশি ;

৪. সঠিক মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অভাব ।

বর্গ : ভার্টিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী

১. সম্প্রসারণশীল কর্দম বেশি ;

২. মাটিতে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয় ;

৩. কর্দমের পরিমাণ ৩০% এর বেশি ;

৪. চুনাপাথর, মার্ল ও ক্ষারীয় শিলা প্রধান উৎস দ্রব্য ;

৫. মিলি সমাঙ্ক ১০০ গ্রাম মাটিতে ৩০% ;

৬. ক্ষারক সম্পৃক্তি বেশি এবং স্তর বিন্যাস অস্পষ্ট ।

উপবর্গ

১. টরার্ট (Torrert) : উষ্ণ অঞ্চলের শুকনো জলবায়ুতে দেখা যায়।

২. উডার্ট (Udert) : বছরব্যাপী আর্দ্র, ফাটল ও ৩ মাসের বেশি উন্মুক্ত থাকে না ;

৩. উস্টার্ট (Ustert) : এক ফসল মৌসুম আর্দ্র থাকে ; ফাটল উন্মুক্ত হয় বছরে ২ বার, উন্মুক্ত সময় প্রায় ৩ মাস ;

৪. জেরার্ট (Xerert) : পানিসেচ ব্যতীত ফসল চাষ করা যায় না।

ভার্টিসল উৎপন্নের প্রক্রিয়া

পানির উপস্থিতিতে সম্প্রসারিত হওয়া প্রধানত মন্টমরিলোনাইট কর্দম কণা শুষ্ক মৌসুমে সংকোচিত হলে ভার্টিসল মাটিতে ফাটল সৃষ্টি হয়। ফাটল সৃষ্টি হওয়ার পর উপরিভাগের মৃত্তিকা কণ পানি প্রবাহের সাথে ফাটলের নিচে গড়িয়ে পড়ে। শুকনো আর্দ্র

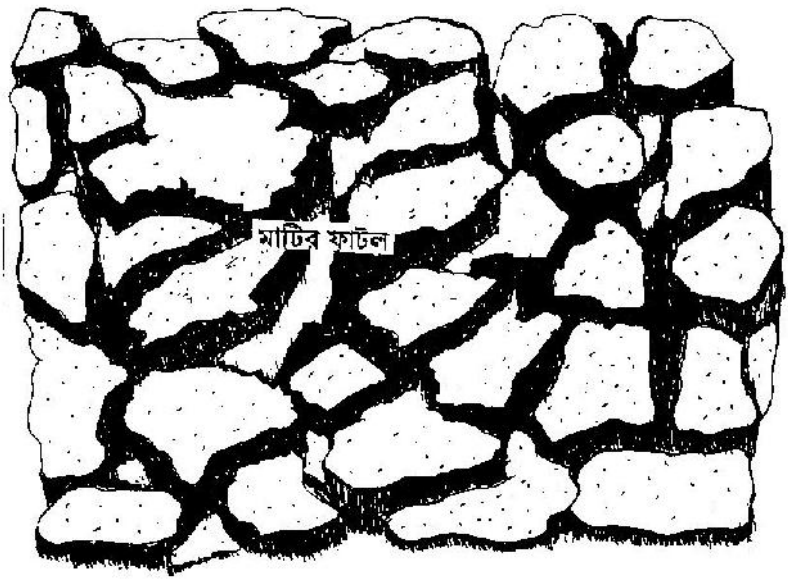

চিত্র ২৪ : পানি শুকিয়ে ফেটে যাওয়া ভার্টিসল মৃত্তিকা

একান্তর মৌসুমে ফাটল সৃষ্টি হওয়া ও গড়িয়ে পড়া মাটি দ্বারা ফাটল বন্ধ হওয়া প্রক্রিয়ায় উপর নিচের মাটি এক হয়ে যায়। উপরের মাটি নিচে যায় বলে একে উল্টে যাওয়া মাটি (Inverted) বলে। *Invert* শব্দ থেকে Vertisol শব্দ নেওয়া হয়েছে। এই মাটিতে প্রথম বৃষ্টির পর দ্রুত গতিতে নিচে চুয়িত হয়। মৃত্তিকা কণা চুয়ানো বা অপসারণ হার মাটি ভিজে গিয়ে সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বৃষ্টির প্রথমে অনুপ্রবেশ হার থাকে ৮ থেকে ১০ সেমি. ঘণ্টা। কিন্তু সঙ্কোচনের শেষ পর্যায়ে এই হার ০.১ ০.২৫ সেমি. ঘণ্টা হতে পারে। এতে প্রথম ও শেষ অনুপ্রবেশ হারের অনুপাত মোটামুটি ৫০ : ১। অক্সিসল ও আল্টিসলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ২ : ৩।

ভার্টিসলের সীমাবদ্ধতা

১. নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি ;
২. জৈব পদার্থ সাধারণত কম ;
৩. বৃহদাকার ফাটল শিকড় বিস্তৃতির জন্য অসুবিধাজনক ;
৪. সম্পৃক্ত অবস্থায় পানি অনুস্রবণ খুবই ধীর

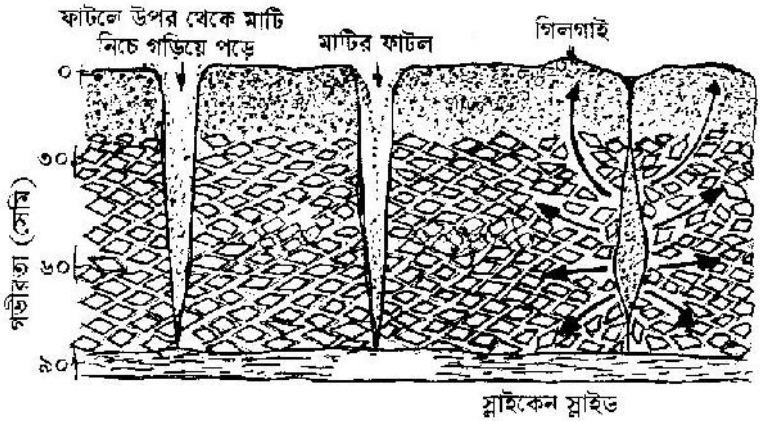

চিত্র ২৫ : ভার্টিসল মৃত্তিকা তৈরির প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের ভার্টিসল মাটির গুণাবলী

১. ৫০ সেমি. গভীরতা স্তরে ৩০% কর্দম রয়েছে ;

২. ফাটল বেশ গভীর ৫০ সেমি. গভীরতার নিচেও ১ সেমি ।

৩. গিলগাই (Gilgai) নিকাশ ও স্লাইকেন সাইড (Slicken side) আছে। বাংলাদেশের এটেল বুনটের পলিমাটি, অগভীর ধূসর ও লালচে বাদামি সোপান মাটিতে রবি মৌসুমে গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়। কিন্তু অধিকাংশ মাটির ৫০ সেমি. গভীরে ফাটলের প্রশস্ততা ১ সেমি. না হওয়ায় (কম হয়) ঠিক ভার্টিসল বলা যায় না । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ ধরনের জমি প্রত্যেক বছর ধান চাষের জন্য কাদা করা হয় বলে এবং প্রতি বছর নতুন নতুন স্থানে ফাটল সৃষ্টি হয় যার ফলে ফাটল গভীরে এতটা প্রশস্ত হওয়ার সুযোগ পায় না।

বর্গ : আলফিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে —

১. বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত ;
২. আর্দ্র জৈলিক নিমস্তর ;
৩. উচ্চ ক্ষারক সম্পৃক্তি ৫০ % ;
৪. লোহা ও এলুমিনিয়ামে প্রাধান্য প্রভাব ;
৫. অম্লমান প্রায় প্রশম ;
৬. A স্তর থেকে কর্দম B স্তরে জমা হয় (২৪–৭৫ সেমি গভীরে) ;
৭. ঝাড়ীয় ধনাত্মক আয়নের পরিমাণ মধ্যম থেকে বেশি ;
৮. আয়নের মধ্যে ক্যালসিয়াম Ca^{++} ও ম্যাগনেসিয়াম Mg^{++} বেশি ;

৯. অক্রিক ও এলবিক স্তর থাকতে পারে ;
১০. আর্দ্র আলফিসলের প্রধান উৎস চুনপ্রধান দ্রব্য, তবে চুয়িত বলে বিক্রিয়া কিছুটা অম্লীয়।

উপবর্গ

১. একুয়ালফ (Aqualf)
২. বোরালফ (Boralf) : অতিরিক্ত ঠাণ্ডা এলাকায় আলফিসল ;
৩. উডালফ (Udalf) : মাটিতে সারা বছর আর্দ্রতা থাকে ;
৪. উস্টালফ (Ustalf) : এক ফসল (ঋতুভিত্তিক) সময় আর্দ্রতা থাকে ;
৫. জেরালফ (Xeralf) : ফসল চাষের জন্য সেচ আবশ্যক ।

আলফিসলের বিস্তৃতি ও সীমাবদ্ধতা

আয়তনের বিবেচনায় এরিডিসলের পরই আলফিসলের স্থান। পূর্বে শ্রেণীকৃত ধূসর বাদামি পডজলিক মাটি, চুনহীন বাদামি মাটি, ধূসর অরণ্য মাটি ও ক্ষয়ীভূত চার্নোজেম (degraded chernozm) মাটি এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

১. নিকাশের সুবিধা থাকা দরকার ;
২. সেচের সুবিধা থাকা দরকার ;
৩. অতিরিক্ত ভূমিক্ষয় ;
৪. নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি।

বাংলাদেশের আলফিসল মাটি : বাংলাদেশের আলফিসল মাটির ধর্ম হচ্ছে —
প্রথমত, এরজিলিক স্তর
দ্বিতীয়ত, ক্ষারক সম্পৃক্তি ৩৫ ٪।

বাংলাদেশের কয়েক প্রকার অগভীর লালচে সোপান এবং গভীরভাবে ক্ষয়ীভূত ধূসর সোপান মাটি আলফিসলের অন্তর্ভুক্ত (তবে এখনো সুনিশ্চিত নয়)।

বর্গ : অক্সিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী–

১. সবচেয়ে ক্ষয়ীভূত মাটি ;
২. সিলিক কম, Al-Fe বেশি ;
৩. উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটি ;
৪. উত্তম নিকাশ সম্পন্ন পুরাতন মাটি ;
৫. কর্দম চুয়নী কম ;
৬. কর্দমের বিচ্ছুরণ (dispersion) কম ;
৮. অক্রিক নিম্নস্তর ও প্লিন্থাইট স্তর আছে ;
৯. পানি ভেদ্যতা বেশি কিন্তু ভূমিক্ষয়শীলতা (erodibility) কম ।

উপবর্গ

১. একুওক্স (Aquox) : অতিরিক্ত আর্দ্রতা, প্লিন্থানাইট রয়েছে ;
২. উডক্স (Udax) ;
৩. পেরোক্স (Perox) ;
৪. টরোক্স (Torrox) : তপ্ত ও শুকনো অঞ্চলে পাওয়া যায় ;
৫. উস্টক্স (Ustox) : এক ফসল ঋতু আর্দ্র থাকে (৯০ দিন)।

অক্সিসলের বিস্তৃতি ও সীমাবদ্ধতা

উষ্ণ অঞ্চল, ব্রাজিল, মধ্য আমেরিকা বিষুবীয় আফ্রিকা এবং দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় এই মাটি পর্যাপ্ত পাওয়া যায় সীমাবদ্ধতাসমূহ উল্লেখ করা যায়–

১. পুষ্টি উপাদান কম ;
২. N, P ও K এর ব্যাপক ঘাটতি ;
৩. প্লিন্থানাইট লৌহগুটি বেশি হলে অসুবিধা হয়, সর্বদা ফসলাবৃত রাখতে হয়।

বাংলাদেশের অক্সিসল মাটি : এর প্রধান প্রধান গুণবলী–

১. তীব্রভাবে ক্ষয়ীভূত তবে স্তরে বিন্যাস অস্পষ্ট ;
২. ক্ষয়যোগ্য খনিজ কম ;
৩. ধনাত্মক আয়ন বিনিময় ক্ষমতা কম ;
৪. কর্দম বিচ্ছুরণ < ৫%।

বাংলাদেশের লাল মাটির গুণাবলী

কর্দম বিচ্ছুরণ কিছুটা বেশি। এই মাটিসহ পাহাড়ী এলাকায় স্থানে স্থানে অক্সিসল মাটি পাওয়া যেতে পারে।

বর্গ : স্পোডোসল

এই মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী—

১. তীব্রভাবে চুয়িত এলাবিকস্তর (A_2) ও স্পোডিক নিম্নস্তর (B_2) আয়রন অক্সাইড অথবা হিউমাস ;
২. কনিফার উদ্ভিদ এই মাটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ;
৩. কম তাপ, আর্দ্র ও বেলে মাটিসম্পন্ন অরণ্যে এই মাটি বেশি পাওয়া যায় ;
৪. মাটির কালচে জৈব লিটার স্তরের উপস্থিতি।

কনিফার উদ্ভিদ যেমন– পাইন গাছের পাতা ও কাণ্ডে ক্ষারক উপাদানের তুলনায় লোহা ও এলুমিনিয়াম বেশি থাকে ফলে পাইন–লিটার পতনের পর মাটির উপরিভাগে তীব্র অম্লত্ব উৎপন্ন হয়, যা অধিকাংশ খনিজ ও জৈব দ্রব্য ক্ষয়ে সহায়তা করে। অবশ্য এই অম্লত্ব কোয়ার্জ ক্ষয়ীভবনের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য উপরের স্তরে বালি কণায় প্রাধান্য থাকে। উপরের স্তর থেকে চুয়ে যাওয়া দ্রব্যের সাথে লোহা ও এলুমিনিয়াম জৈব পদার্থ সহযোগে

নিম্নস্তরে জমা হয়। এই স্তরের নাম স্পোডিক স্তর। স্পোডিক স্তর উৎপন্নের জন্য মাটিতে অনুপ্রবেশ হার বেশি থাকা দরকার।

উপবর্গ

১. **একুওড** (Aquod) : অতিরিক্ত আর্দ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়;
২. **ফেরোড** (Ferrod) : এই মাটিতে আয়রন অক্সাইডের সঞ্চয় বেশি;
৩. **হিউমড** (Humod) : মাটির উপরে স্তরে হিউমাস বেশি;
৪. **অর্থড** (Orthod) : টাইপিক স্পোডোসল।

স্পোডোসলের বিস্তৃতি ও সীমাবদ্ধতা

কানাডা, উত্তর ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়াতে প্রচুর স্পোডোসল মাটি পাওয়া যায়।

সীমাবদ্ধতা

১. পুষ্টি উপাদান ঘাটতি;
২. চুনের ঘাটতি;
৩. উপরে বালির পরিমাণ বেশি থাকায় মাটির উর্বরতা কিছুটা কম।

বর্গ : আল্টিসল

এই মাটির প্রধান প্রধান গুণাবলী—

১. তীব্রভাবে চুয়িত মাটি;
২. ক্ষারক সম্পৃক্তি কম ৩৫ %;
৩. আরজিলিক নিম্নস্তর আছে;
৪. কেওলিনাইট কর্দম বেশি, জৈব পদার্থ কম;
৫. মাটির ৫০ সেমি. গভীরতা পর্যন্ত কর্দমের পরিমাণ ৩৫ %;
৬. নির্যাসযোগ্য এলুমিনিয়ামের পরিমাণ উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত হতে পারে;
৭. কর্দমত্বক (Clay skin) ও ফ্রেজিপেন রয়েছে;
৮. A স্তর বলে দো-আঁশ B স্তর এঁটেল প্রকৃতির (অধিকাংশ ক্ষেত্রে)।

আর্দ্র অঞ্চলে আল্টিসল বেশি। মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর আল্টিসল মাটি রয়েছে। উষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা ৮.০ সেঃ এর বেশি হলে এবং সাভানা (Savanna) বনানীতে এই মাটি উৎপন্ন হয়। লাল মাটিসম্পন্ন অরণ্য এবং ঘাসী জমির সমন্বয়ে সৃষ্ট বনানীকে সাভানা বলে।

উপবর্গ

১. **একুয়াল্ট** (Aqualts) : আর্দ্র জলবায়ুর আল্টিসল মাটি।
২. **হিউমাল্ট** (Humult) : হিউমাস বেশি, আরজিলিক নিম্নস্তরের উপরের ১৫ সেমি. গভীরতায় অধিক জৈব কর্বন থাকে। হাওয়াইয়ে প্রচুর হিউমাল্ট মাটি রয়েছে।

৩. উডাল্ট (Udult) : বছরব্যাপী মাটি আর্দ্র থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উডাল্ট উপবর্গের প্রচুর মাটি পাওয়া যায়।

৪. উস্টাল্ট (Ustult) : বছরে এক ফসল মৌসুমী আর্দ্রতা থাকে।

৫. জেরাল্ট (Xerylt) : অধিকাংশ সময় শুকনো থাকে। নিম্নস্তরের মাটি লালচে। পূর্ব শ্রেণীকৃত (১৯৪৯) লাল হলদে পডজলিক মাটি, লালচে বাদামি লেটারাইট ও সংশ্লিষ্ট প্লেনোসল (Planosol) এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আল্টিসলের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

১. অ্যালফিসলের চেয়ে আল্টিসল অধিক ক্ষয়ীভূত চুয়িত ও উজ্জ্বল;

২. অ্যালফিসলে আরজিলিক ও মলিকস্তর আছে, কিন্তু আল্টিসলে কেবল আরিজিলিক স্তর আছে কিন্তু মলিক স্তর নেই;

৩. আল্টিসলে ক্ষয়ের তীব্রতা অক্সিসলের চেয়ে কম;

৪. কেওলিনাইটের প্রাধান্যের জন্য আল্টিসলের CEC কম;

৫. উষ্ণ অঞ্চলে নানা স্থানে আল্টিসল ও অক্সিসল মিশ্রভাবে অবস্থান করতে পারে;

৬. আল্টিসলের অম্লমান স্পোডোসলের চেয়ে কম;

৭. অ্যালফিসলের চেয়ে আল্টিসলের অম্লত্ব ও চুয়ানী বেশি।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্তিকা পানির গুরুত্ব ও শ্রেণীকরণ

১। প্রাকৃতিক পানিচক্র

ভূ-পৃষ্ঠ, সাগর ও বায়ুমণ্ডলে পানি একটি সতত বিরাজমান অত্যাবশ্যক পদার্থ তরল, বায়বীয় ও কঠিন সকল আকারেই পৃথিবীতে পানি অবস্থান করে সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করা যায়, প্রাকৃতিকভাবে সতত ঘটমান সাগর ও স্থলভূমিজ বাষ্পায়ন, বারিপাত, ভূ-গর্ভ, সঞ্চয়ন, উপরপ্রবাহ, চুয়ানী এবং সমুদ্রে জমা হওয়ার সাধারণ প্রক্রিয়াক্রমকে পানিচক্র বলা যায়।

প্রাকৃতিক পানিচক্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং জটিল প্রক্রিয়া, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বেশ সুশৃঙ্খল। সারা বিশ্বের জল ও স্থলভূমির মধ্যে এবং স্থলভূমির বিভিন্ন দেশ-মহাদেশ-অঞ্চল ভিত্তিতে সকল পানির রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর যে কোনো ব্যতিক্রম বার্ষিক বা ঋতু এলাকাভিত্তিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত, ইত্যাদি-এ ধরনের প্রাকৃতিক বিঘ্ন বিপর্যয়ের উদারহণ। প্রাকৃতিক পানি চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে জৈবিক প্রয়োজনে ও উৎপাদনশীল কাজে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পানির উৎপাদনশীল ব্যবহারের মধ্যে সেচের মাধ্যমে কৃষি ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ এবং উপযুক্ত সেচের মাধ্যমে পানির মতো কৃষি উপকরণের দক্ষ ব্যবহার আধুনিক কৃষির একটি অপরিহার্য অংশ। শুষ্ক এলাকায় পানি সেচ এবং আর্দ্র এলাকায় পানি সেচ ও নিকাশের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যা খাদ্যের চাহিদা মিটানোর জন্য অত্যাবশ্যক। লোনা পানি পরিশোধন ও ব্যবহার সেচের কাজে বরফ গলা পানি ব্যবহার, চলমান পানি ও ভূ-গর্ভে পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, কৃত্রিম, বৃষ্টিপাত শিলা বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ আধুনিক পানিচক্র ব্যবস্থাপনার বিশেষ বিশেষ উপাদান।

সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর বৃষ্টিপাত ও তুষার পাতের মাধ্যমে প্রায় ৪৭ বিলিয়ন হেক্টর মিটার (৪৬৪৫২৩ বিলিয়ন ঘন মিটার) পানি পতিত হয়। ৩৭ বিলিয়ন হেক্টর মিটার পানি পতিত হয় সমুদ্র এবং ১০ বিলিয়ন হেক্টর মিটার পতিত হয় স্থলভাগে। সমুদ্রে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় বাষ্পায়ন হয় তার চেয়ে প্রায় ৯% বেশি। যার ফলে এই ৯% অতিরিক্ত পানির সাম্যতা রক্ষার জন্য প্রতি বছর সোয়া তিন বিলিয়ন হেক্টর মিটার বা ৩৩৩০০ বিলিয়ন ঘন মিটার পানি বড় বড় নদী, হিমবাহ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী ঝরণা দ্বারা সমুদ্রে প্রবেশ করছে

বিশ্বের প্রায় সোয়া ছয় বিলিয়ন হেক্টর জমির পানি বহমানকারী প্রায় ৭০টি বড় বড় নদী ও এগুলোর শাখাপ্রশাখা ১৭০০ বিলিয়ন ঘন মিটার পানি সমুদ্রে নিয়ে যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে স্থলভাগের মাত্র ১% জমিতে সেচ দেয়া হয়; যার জন্য মাত্র ১৫০ বিলিয়ন ঘন মিটার পানি প্রয়োজন।

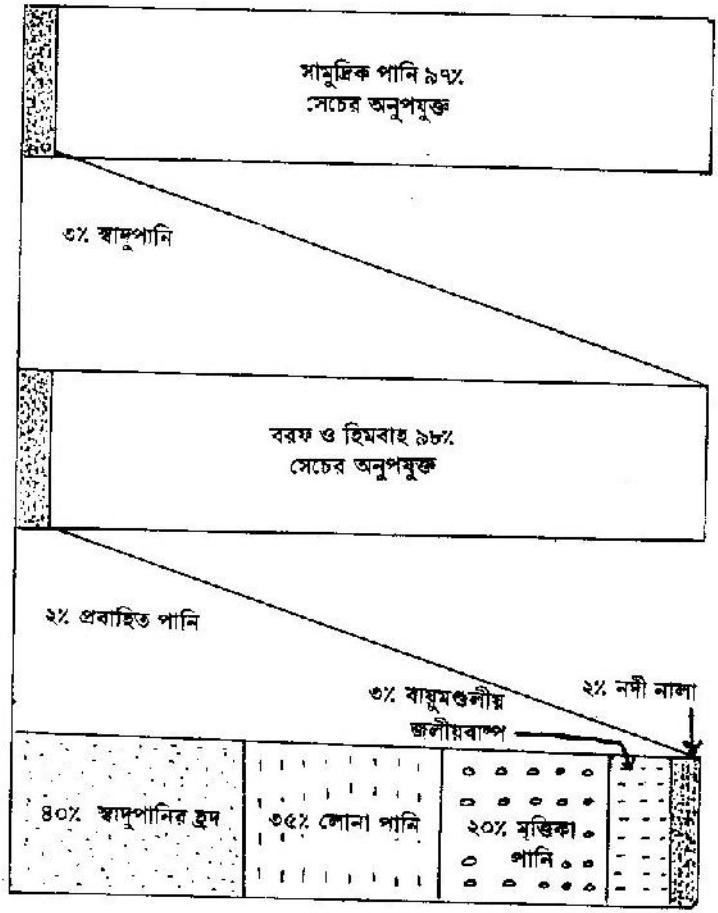

চিত্র ২৬ : ভূ-পৃষ্ঠ পানির প্রবাহ ধারা

পানি চক্রের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

ভূ-পৃষ্ঠ ও প্রাকৃতিক পানি চক্রের প্রধান ৩টি অংশ হচ্ছে —

১. ভূ-পৃষ্ঠ পানির প্রাপ্তি ;
২. ভূ-পৃষ্ঠ পানির অপচয় ;
৩. পানি সংরক্ষণ ;

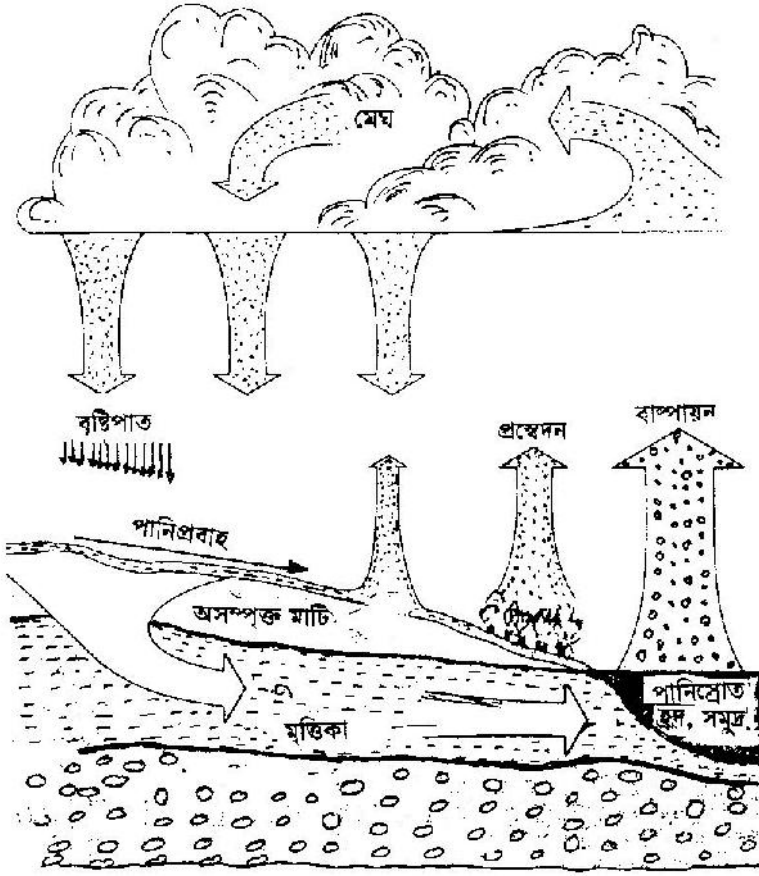

চিত্র ২৭ : সরল পানিচক্র

পানির প্রকার

১. **আকারগত** : তরল, কঠিন, বায়বীয় ;

২. **অবস্থানগত** : বায়ুমণ্ডল, ভূ-পৃষ্ঠ, মৃত্তিকা আর্দ্রতা, সমুদ্র, জৈবিক (উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ), হিমমণ্ডল ;

৩. **গুণগত** : লোনাপানি, স্বাদুপানি ভূ-গর্ভ পানি।

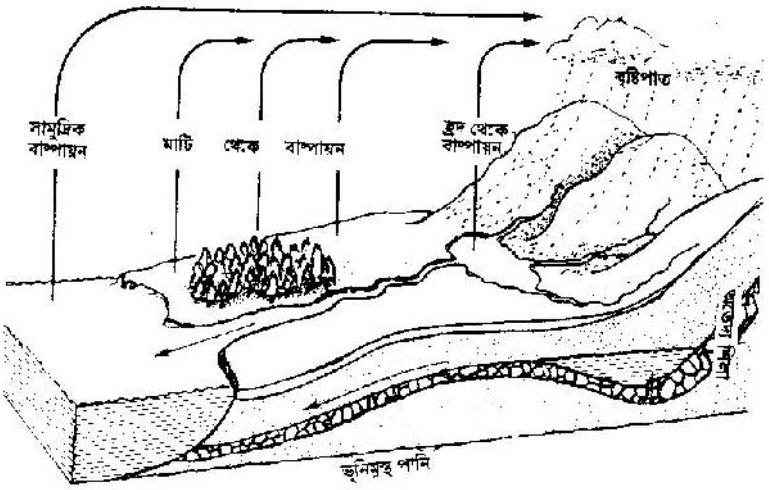

চিত্র ২৮ : প্রাকৃতিক পানিচক্রে বাষ্পায়ন ও প্রবাহ

ভূ-পৃষ্ঠ পানির প্রাপ্তি

ভূ-পৃষ্ঠ পানি প্রাপ্তির প্রধান প্রধান প্রক্রিয়া নিচে উল্লেখ করা হলো —

ক. বারিপাত

১. বৃষ্টিপাত (Rainfall) : আর্দ্র ও অবআর্দ্র অঞ্চলে এবং ঋতুভিত্তিতে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

২. শিলাবৃষ্টি (Hail) : আর্দ্র, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বেশি হয়।

৩. তুষার ও তুষার বৃষ্টি (Snow and slect): হিম অঞ্চলে বেশি হয়।

৪. কুয়াশা (Fog) : আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলসমূহে কুয়াশা বেশি হয়।

খ. ঘনীভবন (Condensation)

১. শিশির (Dew)

গ. পরিশোষণ (Absorption)

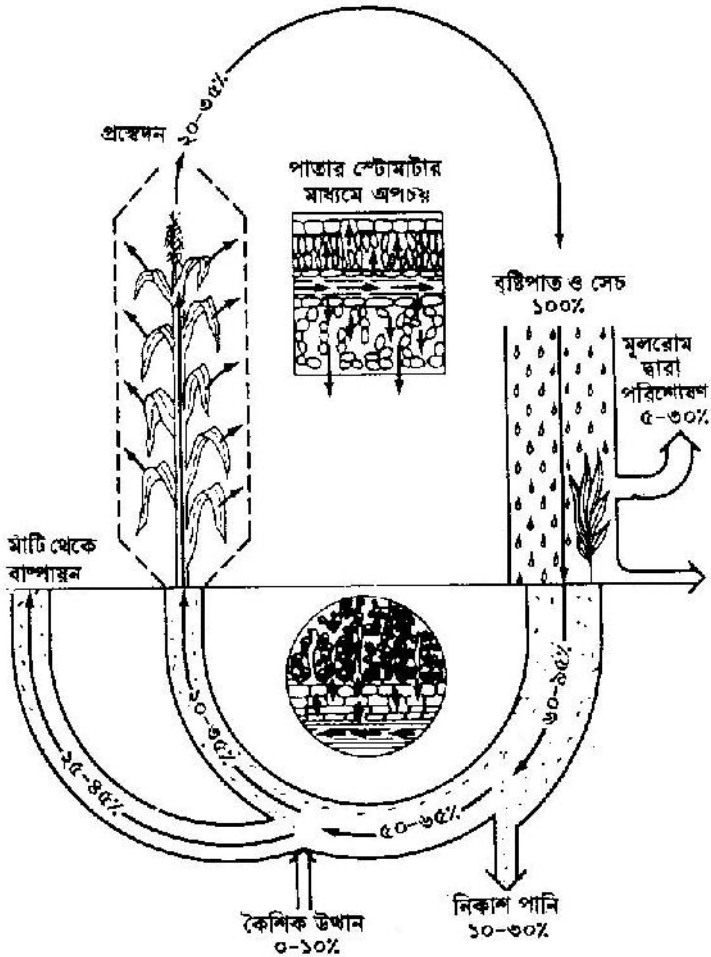

চিত্র ২৯ : মৃত্তিকা, উদ্ভিদ ও বায়ুমণ্ডলে পানি প্রবাহ চক্র

মৃত্তিকা পরিশোষণ : প্রাকৃতিক পানি চক্রে পানির অপচয় বলতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানা উপায়ে অপসারণ বুঝায়। তরল বা বাষ্পীয় উভয় আকারেই তা হতে পারে। অপচয় বা অপসারণ প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে —

১. প্রবহমান নদী, নালা, খাল, ভূ-পৃষ্ঠ ;
২. অনুস্রবণ : পানির ভূ-ত্বক ভেদ ও চুয়ানী ;
৩. বাষ্প প্রস্বেদন : ভূ পৃষ্ঠ থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে অপচয়।

পানি সংরক্ষণ (Water storage): পানি চক্রের মধ্যে সংরক্ষণ পর্যায়টি বেশ ব্যাপক। সমুদ্র, হিম অঞ্চলের বরফ, বায়ুমণ্ডল, মৃত্তিকা ও জৈবিক পানি সকলই পানি সংরক্ষণেরই নামান্তর। যাহোক সংরক্ষণের প্রধান প্রধান বিষয় হচ্ছে —

১. ভূ-পৃষ্ঠ সংরক্ষণ,
২. বায়ুমণ্ডল,
৩. জৈবিক পানি (উদ্ভিদ ও প্রাণী),
৪. মৃত্তিকা আর্দ্রতা বৃদ্ধি,
৫. সমুদ্র,
৬. হিমমণ্ডল।

পানির ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য

একটি পানি মৌলের ব্যাস প্রায় ২.৬ অ্যাঙ্গস্ট্রম। এর মধ্যে অক্সিজেনই অধিকাংশ জায়গা জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে।

অবশ্য পানির একক মৌল এককভাবে অবস্থান করতে পারে না। হাইড্রোজেন বন্ধনীর (bond) মাধ্যমে মৌলসমূহ পারস্পরিকভাবে যুক্ত থাকে। বাষ্পীয় পানিতেও কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন বন্ধনী থাকতে পারে।

বরফ, পানি ও বাষ্প আকারের মধ্যে বাষ্প আকারের গতিশক্তি সবচেয়ে বেশি বরফ আকারে সবচেয়ে কম। বরফ গলনের জন্য ৮০ কিলোক্যালোরি / গ্রাম শক্তি প্রয়োজন এবং তরল পানি বাষ্পায়নের জন্য ৫৮০ ক্যালোরি / গ্রাম শক্তি প্রয়োজন।

মৃত্তিকা পানির উৎস

কৃষি মৃত্তিকার জন্য পানি একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। মাটিতে পানির প্রধান প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টি, তুষার, শিশির ও কুয়াশা। জলবায়ু অনুসারে আর্দ্র অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি। হিম অঞ্চলে তুষারপাত বেশি। পরিমাণের দিক থেকে শিশির ও কুয়াশা উৎসের গুরুত্ব কম, কম উন্নত অঞ্চলের ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকা সংরক্ষিত আর্দ্রতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ করা যায়, সেচের পাশাপাশি মাটির পানি ধারণ বা সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং এই আর্দ্রতা ব্যবস্থাপনার উপর মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে।

মৃত্তিকা ও ফসল উৎপাদনে পানির ভূমিকা

১. মাটির জৈবিক ও অণুজৈবিক কার্যাবলী বাড়ায়;
২. জৈব পদার্থের বিয়োজন হার বাড়ায়;
৩. মাটির তাপ নিয়ন্ত্রণ করে;
৪. মাটি নরম করে ও কর্ষণ সহজতর করে;
৫. পুষ্টি উপাদান ও সার দ্রব্যের দ্রাবক ও পরিবাহক হিসেবে কাজ করে;
৬. সালোকসংশ্লেষণ ও অণুজৈবিক বিপাকের জন্য পানি অত্যাবশ্যক;
৭. পানি মাটির বর্ণ গাঢ় করে;

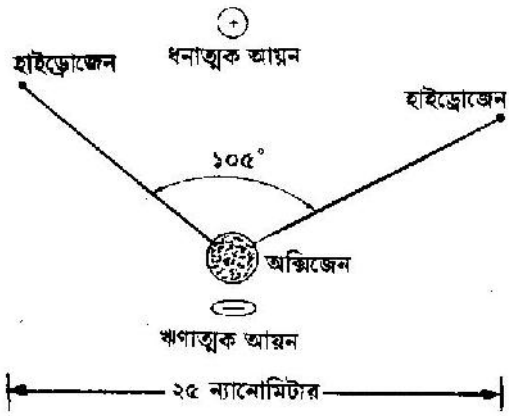

চিত্র ৩০ : মৃত্তিকা কণায় পানি মৌলে আধানের অবস্থান ও পোলারিটি

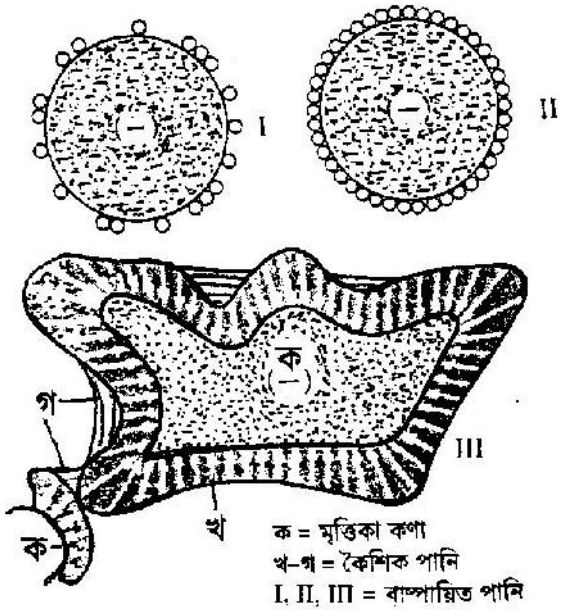

চিত্র ৩১ : মৃত্তিকা কণা ও পানি মৌল

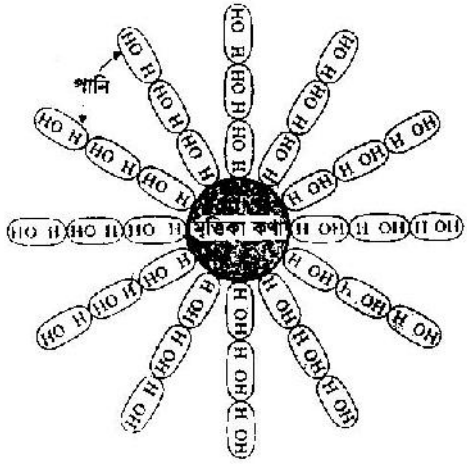

চিত্র ৩২ : মৃত্তিকা কণায় পানি উপশোষণ

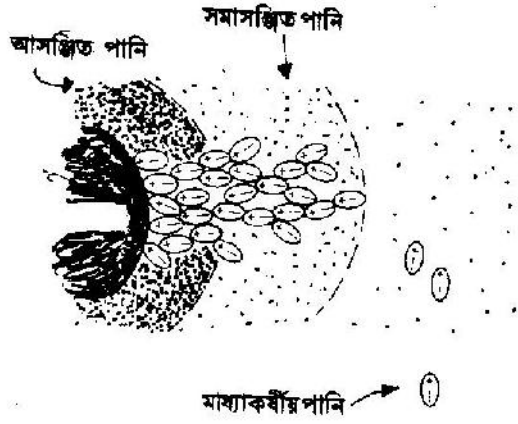

চিত্র ৩৩ : মৃত্তিকা কণা ও পানির অবস্থানভিত্তিক প্রকার

৮. উদ্ভিদের সতেজতা রক্ষা করে ;
৯. শিলা ও খনিজের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে ;
১০. বীজত্বক নরম করে, হরমোন উৎপাদনে সহায়তা ও অঙ্কুরোদগম ঘটায় ;
১১. অতিরিক্ত পানি বা জলাবদ্ধতা অধিকাংশ ফসলের জন্য ক্ষতিকর।

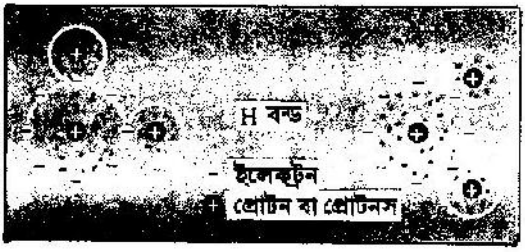

চিত্র ৩৪ : মৃত্তিকা কণায় পানি মৌলের ইলেকট্রন বিনিময় ও বন্ধন

২। মৃত্তিকা পানির শ্রেণীকরণ (Classification of Soil Water)

উদ্দেশ্য ও আচরণের ভিত্তিতে মৃত্তিকা পানিকে নানাভাবে ভাগ করা হয়েছে—

১. মৃত্তিকা কণার সাথে মাধ্যাকর্ষণ বা সহগ অনুসারে ;
২. মৃত্তিকা আর্দ্রতার ধ্রুবক অনুসারে ;
৩. জৈবিক বা প্রাপ্যতা অনুসারে ;
৪. অবস্থান আকার অনুসারে।

মাধ্যাকর্ষণ ও সহগভিত্তিক শ্রেণীকরণ

ক. মাধ্যাকর্ষী পানি ;
খ. কৈশিক পানি ;
গ. বাষ্পীয় পানি ।

মাধ্যাকর্ষী পানি : যে পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিম্নদিকে অপসারিত হয় এবং মৃত্তিকা কণার সাথে $\frac{1}{3}$ টেনশনেরও কম শক্তিতে আসঞ্জিত (adhered) থাকে তাকে মাধ্যাকর্ষী পানি বলে। মাধ্যাকর্ষী পানির অন্যান্য নাম মুক্ত পানি, নিকাশ পানি, অস্থায়ী পানি, ইত্যাদি

মাধ্যাকর্ষী পানির বৈশিষ্ট্য

১. মাটির স্থূল রন্ধ্রে এই পানি অবস্থান করে (আবদ্ধ অবস্থায়) ;
২. সহজেই মাটি থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যায় ;
৩. তরল অবস্থায় চলাচল করে ;
৪. ৫০–১০০% রন্ধ্র পরিসর আবদ্ধ রাখে ;
৫. উদ্ভিদের জৈবিক প্রয়োজনে আসে না ;
৬. ভূমিক্ষয়ের কারণ হতে পারে ;
৭. চলাচলের সময় পুষ্টি উপাদানের অপচয় ঘটায় ;
৮. এই পানি আটকে রাখা অধিকাংশ ফসল উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা জীবের জন্য ক্ষতিকর।

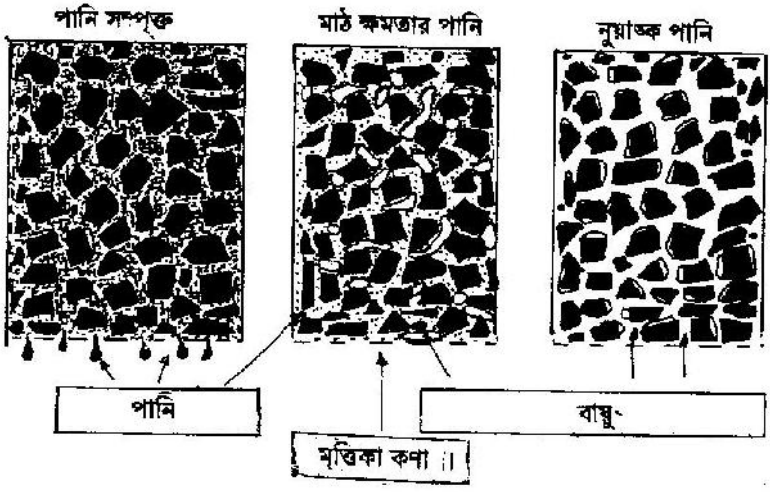

চিত্র ৩৫ : মৃত্তিকায় পানির শ্রেণীভিত্তিক অবস্থান

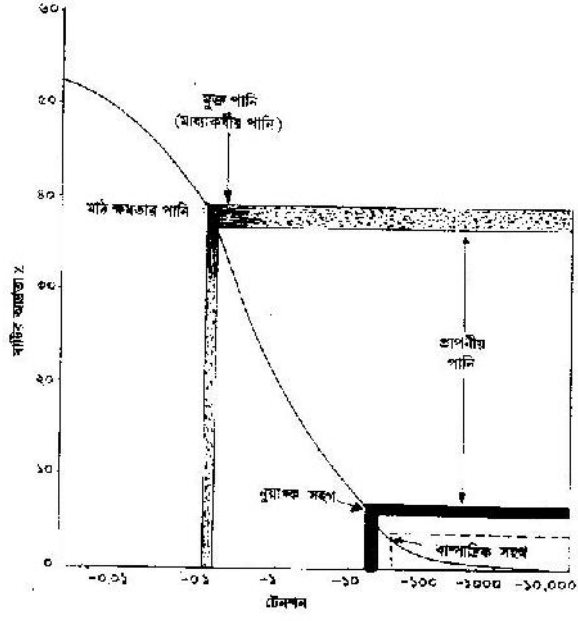

চিত্র ৩৬ : মৃত্তিকার শ্রেণীভিত্তিক আর্দ্রতা প্রাপ্তীয়তা

সারণি ৯ : কৈশিক পানি, বাষ্পার্দ্রিক পানি ও মাধ্যাকর্ষী পানির মধ্যে পার্থক্য

গুণাবলী	কৈশিক	বাষ্পার্দ্রিক	মাধ্যাকর্ষী
১. উদ্ভিদের জন্য প্রাপ্যতা	অংশ বিশেষ অপ্রাপ্য (১৫-৩১ বার)।	সকল পানি অপ্রাপ্য।	সকল পানি অপ্রাপ্য।
২. চলাচল	স্তর সম্পৃক্তায়ন তরল আকারে।	বাষ্পীয় আকারে।	তরল আকারে।
৩. আকর্ষণ	$\frac{১}{৩}$ থেকে ৩১ বার।	৩১ থেকে ১০, ০০০	$\frac{১}{৩}$ বারের কম
৪. পুষ্টি উপাদান	দ্রবীভূত থাকে।	থাকে না।	অপচয় হতে পারে।
৫. পরিমণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান	ভৌত গঠন বুনট সংযুক্তি, হিউমাস।	বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা ও ভৌত গঠন।	ঢাল।
৬. pF	২ · ৫ – ৪·৫	৪ ·৫ – ৭ ·০	০ – ৫· ০
৭. সমকক্ষ অবস্থা	মাটির জো–অবস্থা।	বায়ু শুষ্ক মাটি	সম্পৃক্ত মাটি
৮. সেচের হিসেবে	ধরা হয়।	ধরা হয় না	ধরা হয় না।
৯. নির্ধারণ	মাঠ ক্ষমতার পানি দ্বারা।	বায়ু শুকনো মাটি থেকে।	অতিরিক্ত পানি।
১০. চলাচল	মাধ্যাকর্ষণ বিভব	পানি বিভব।	বায়ু আর্দ্রতার পার্থক্য।
১১. অবস্থান	মধ্যম ও সূক্ষ্ম রন্ধ্র।	খুবই সূক্ষ্ম রন্ধ্র।	স্থূল রন্ধ্র
১২. চলার গতি	ধীর।	খুবই ধীর।	দ্রুত।
১৩. অপর নাম	মৃত্তিকা দ্রবণ।	বাষ্পীয় পানি	মুক্ত পানি।

মাধ্যাকর্ষী পানির মাটিতে চলাচলকে সম্পৃক্ত প্রবাহ বলে। বাষ্পার্দ্রিক পানি প্রধানত ব্যাপন ও সমপ্রবাহের মাধ্যমে চলাচল করে। কৈশিক পানি নিম্ন টেনশন থেকে উচ্চ টেনশনে চলাচল করে।

pF

সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যে পানির স্তম্ভের উচ্চতার লগারিদমকে pF বলা হয়, যা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে মাটিতে যুক্ত থাকার শোষণ শক্তি বা চাপ শক্তির সমান। মাটিতে pF ২ · ৫ থেকে ৪· ২ থাকলে উদ্ভিদ অত্যন্ত সহজে পানি পরিশোষণ করতে পারে। নুয়াব্দ পানির pF মান ৪·৫ এর বেশি হয়ে থাকে।

কৈশিক পানি : যে পানি মাটি কণার সাথে আসঞ্জন (adhesion) ও পৃষ্ঠটান বলের মাধ্যমে মৃত্তিকা কৈশিক রন্ধ্রে অবস্থান করে তাকে কৈশিক পানি বলে। এই পানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে —

১. বেশ কিছু সময় মাটিতে অবস্থান করে ;

২. এই পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান থাকে ;

৩. এই পানিকে মৃত্তিকা দ্রবণ বলা হয় ;
৪. রন্ধ্র পরিসরের ১৫ থেকে ৫০ % এই পানিতে পরিপূর্ণ থাকে ;
৫. মাটিতে স্তর সম্প্রসারণের (film adjustment) মাধ্যমে চলাচল করে ;
৬. $\frac{১}{৩}$ থেকে ৩১ বার টেনশনে এই পানি অবস্থান করে যার মধ্যে $\frac{১}{৩}$ থেকে ১৫ বার পর্যন্ত উদ্ভিদ পরিশোষণ করতে পারে।

সূক্ষ্ম বুনট দানাদার সংযুক্তি ও বিযোজিত জৈব পদার্থের (হিউমাস) উপস্থিতি মাটিতে কৈশিক পানির পরিমাণ বাড়ায়।

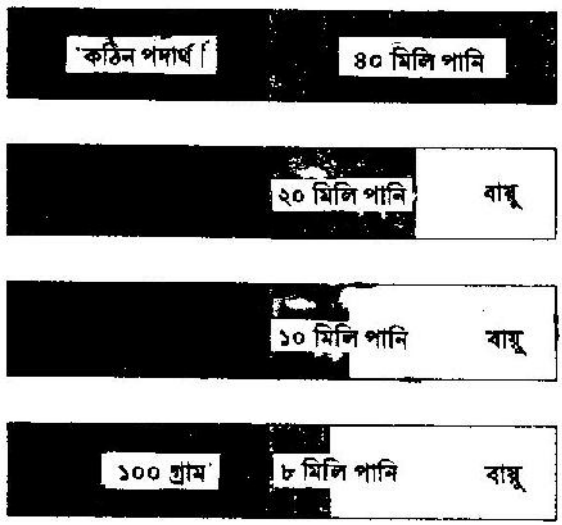

চিত্র ৩৭ : মৃত্তিকা পানির বিভিন্ন শ্রেণীতে পানি ও বায়ুর আনুপাতিক পরিমাণ

বাষ্পার্দ্রিক পানি : যে পানি মৃত্তিকা কণার উপরিভাগে আসাঞ্জিত থাকা অবস্থায় বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প (৯৮% আপেক্ষিক আদ্রতা) থেকে পরিশোষিত হয়ে থাকে তাকে বাষ্পার্দ্রিক পানি বলে। এই পানির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —

১. মৃত্তিকা কণার সাথে ঘনিষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ৪ থেকে ৫ মিলিমাইক্রন পুরু স্তরে অবস্থান করে ;
২. বাষ্পীয় আকারে চলাচল করে ;
৩. জীবের জন্য (উদ্ভিদ বা অণুজীব) অপ্রাপ্য

মাঠ ক্ষমতার আর্দ্রতা

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে মৃত্তিকা দ্রব্য নিজস্ব আকর্ষণ দ্বারা যে পানি আটকে রাখতে পারে তাকে মাঠ ক্ষমতা বলে। জমিতে মাঠ ক্ষমতার পানির পরিমাণ প্রায় $\frac{1}{3}$ বার শক্তির সমকক্ষ। মাঠ ক্ষমতার পানির পরিমাণ প্রধানত মাটির বুনট, সংযুক্তি, জৈব পদার্থ ও ভূ-নিম্নস্থ পানির উচ্চতার উপর নির্ভর করে।

বায়ু-শুকনো ওজন

বায়ু-শুকনো ওজনের ভিত্তিতে মাটির আর্দ্রতা বিষয়ে কেবল একটা গড় ধরণা করা যায়। এই আর্দ্রতায় ভিত্তিতে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে মৃত্তিকা গবেষণায় সূক্ষ্ম ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা স্থান ও কালভেদে ভিন্ন হয় যা বায়ু-শুকনো ধ্রুবককে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু-শুকনো মাটিতে আর্দ্রতা প্রায় ১,০০০ বার শক্তির সমান ধরা যায়। বায়ু শুকনো মাটিকে অনেক সময় ধরেয়া তপে শুকনো মাটিও বলে।

মাটির গুণগত মাঠ পরীক্ষা অনেক সময় বায়ু শুকনো ওজন ভিত্তিতে প্রকাশ করা যায়। যেমন- বর্ণ, হস্তানুভূতি, জৈব মাটির স্থূল জৈব দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ। কোনো বায়ু শুকনো মাটিতে কি পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে তা চুল্লী শুকনো ওজনের ভিত্তিতে করা হয়।

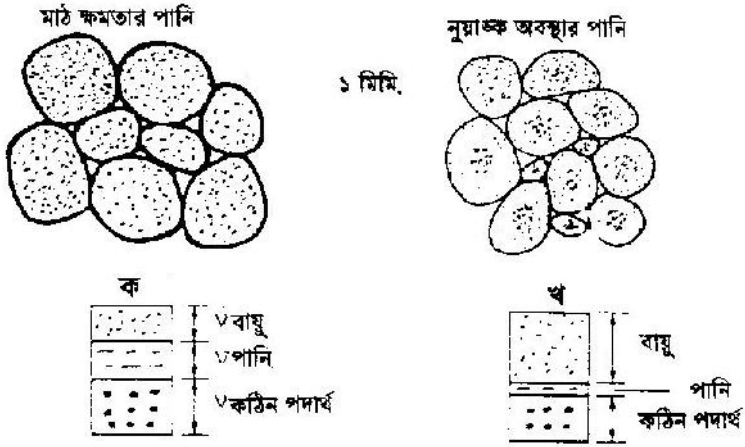

চিত্র ৩৮ : মাঠ ক্ষমতা ও নুয়াঙ্ক অবস্থায় মাটিতে পানির অবস্থান

বাষ্পার্দ্রিক সহগ (Hygroscopic Co-efficient)

বায়ুমণ্ডল থেকে কোনো দ্রব্যের আর্দ্রতা পরিশোষণের সামর্থকে বাষ্পার্দ্রিক সহগ বলে। সাধারণভাবে মাটির বায়ু-শুকনো অবস্থায় যে পানি থাকে তাকে বাষ্পার্দ্রিক সহগের পানি বলে। বায়ু-শুকনো মাটির সময় বিশেষ অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা কমে গেলে বা বেড়ে গেলে

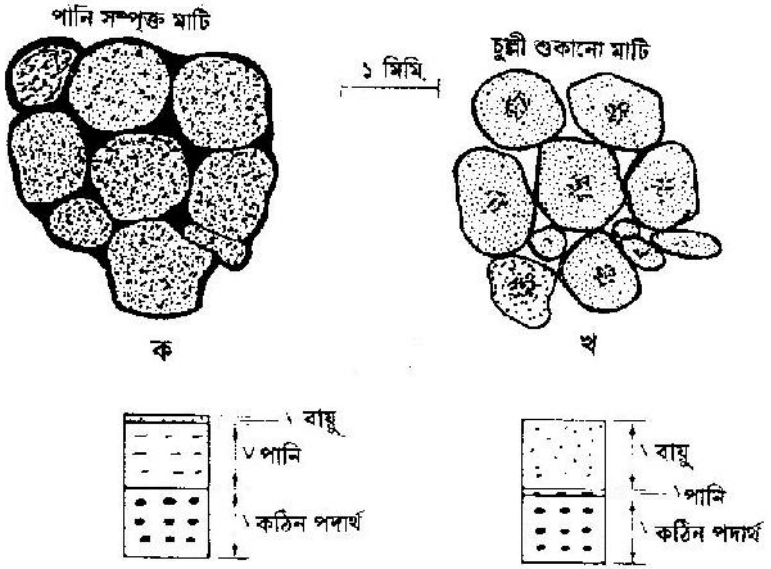

চিত্র ৩৯ : পানি সম্পৃক্ত ও চুল্লী শুকনো মাটিতে পানির অবস্থান

আর্দ্রতায় কমবেশি হয়ে থাকে। কোন চুল্লী-শুকনো মাটির প্রয়োজনীয় নমুনা ২৫° সে: তাপে জলীয়বাষ্প সম্পৃক্ত বায়ুমণ্ডলে ১২ থেকে ২৪ ঘন্টা রেখে দিলে এবং এর আর্দ্রতা চুল্লী-শুকনো পদ্ধতিতে শুকনো ওজনের ভিত্তিতে বাষ্পাদ্রিক সহগের পানি নির্ধারণ করা যায়। মাটির এই অবস্থায় প্রায় ১৫ % সূক্ষ্ম রন্ধ্রপরিসর পানিপূর্ণ থাকতে পারে।

বাষ্পাদ্রিক পানির বৈশিষ্ট্য

১. ৩১ থেকে ১০,০০০ বার টেনশনে এই পানি আটকে থাকে;
২. ১০৫ সে: তাপে মাটি থেকে এই পানি অপসারণ সম্ভব;
৩. বেলে মাটিতে এই পানির পরিমাণ ২ % তবে সূক্ষ্ম বুনটে ১৫% পর্যন্ত থাকতে পারে;
৪. এই পানি কৃষি জমির সেচ হিসেবে ধরা হয় না।

বায়ু-শুকনো ওজন ও বাষ্পাদ্রিক সহগ সম-ধরনের, তবে বাষ্পাদ্রিক সহগের পানি নির্ধারণ তুলনামূলকভাবে অধিকতর সঠিক হতে পারে। বায়ু-শুকনো ধ্রুবকে জটিলতা কম।

নুয়াঙ্ক সহগ (Wilting Co-efficient)

যে মৃত্তিকা আর্দ্রতায় কৈশিক নালীতে প্রাপ্য পানি থাকে না অর্থাৎ উদ্ভিদ শিকড়ের মাধ্যমে পানি পরিশোষণ করতে পারে না, সেই আর্দ্রতা অবস্থাকে নুয়াঙ্ক আর্দ্রতা বলে। এই অবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে রাতে প্রস্বেদন হার কমে গেলে নুয়ে পড়া ডগা ও পাতা দিনে সোজা হয়ে

উঠে। কিন্তু পানি ঘাটতি কয়েক দিন চলতে থাকলে জমিতে পানি প্রয়োগ করার পরও গাছ সতেজতা ফিরে পায় না। এই পরিস্থিতিকে স্থায়ী নুয়াঙ্ক অবস্থা বলে।

কোনো মাটির নুয়াঙ্ক সহগের আর্দ্রতা চুল্লী-শুকনো ওজনভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়। নুয়াঙ্ক সহগ আর্দ্রতার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :–

১. গাছের প্রজাতি ও জাত ;
২. গাছের প্রকৃতি (শিকড় ও পাতার প্রকার) ও বয়স ;
৩. গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ও বৃদ্ধি হার ;
৪. মৃত্তিকা দ্রবণে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ (খনিজসহ) ;
৫. মাটির মোট রন্ধ্র ও সূক্ষ্ম ও রন্ধ্রের পরিমাণ ;
৬. মাটিতে জৈব পদার্থের প্রকার, পরিমাণ ও পচন পর্যায় ;
৭. মাটির সংযুক্তির প্রকার, শ্রেণী ও ক্রম ;
৮. মাটির বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ও মেট্রিক বিভব।

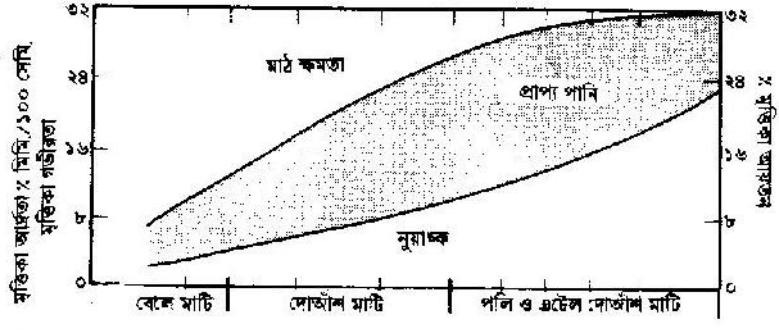

চিত্র ৪৩ : মৃত্তিকার বুনট ও মৃত্তিকার প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা

মৃত্তিকা আর্দ্রতার ধ্রুবকভিত্তিক শ্রেণীকরণ

১. মাঠ ক্ষমতা (Fild capacity);
২. বায়ু-শুকনো ওজন ;
৩. বাষ্পীয় সহগ ;
৪. নুয়াঙ্ক সহগ ;
৫. উত্তম কর্ষণমাত্রার পানি ;
৬. প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা।

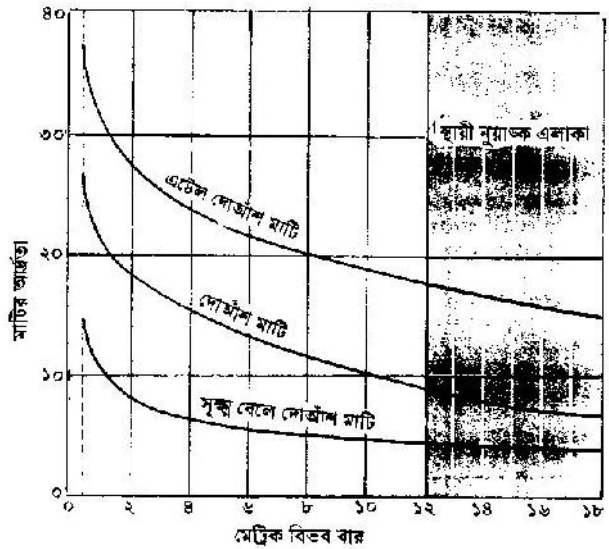

চিত্র ৪১ : মৃত্তিকায় বুনটভিত্তিক ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল বার

কর্ষণ মাত্রা : মাটির যে আর্দ্রতা পরিস্থিতিতে মৃত্তিকা দলার স্বাভাবিক দৃঢ়তা বিদ্যমান রেখে অতি সহজভাবে ভূমিকর্ষণ করা যায়, অথচ মাটি কর্দমাক্ত হয় না বা ঢেলা সৃষ্টি হয় না তাকে উত্তম কর্ষণ মাত্রা (best tillage range) বলে। সাধারণত মাটির মাঠ ক্ষমতার কাছাকাছি আর্দ্রতায় উত্তম কর্ষণ মাত্রায় আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকে।

প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা : অধিকাংশ মঠ ফসল মাঠ ক্ষমতা থেকে নুয়াঙ্কের কাছাকাছি পর্যায় পর্যন্ত আর্দ্রতা পরিশোষণ করে। যদিও পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ করা যায় যে, এটেল বুনট মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, কিন্তু পলি দো-আঁশ ধরনের বুনটের প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। সূক্ষ্ম মৃত্তিকা কণা প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে, যদিও তাতে মোট পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়াবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্তিকা পানির বিভব, চলাচল ও ব্যবস্থাপনা

১। মৃত্তিকার পানি বিভব

মৃত্তিকা ও একক পানি মৌলের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তি মৃত্তিকার পানি বিভব একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। একই পৃষ্ঠতলের কোন একক ভরের মাটি থেকে একক ভরের পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে এবং সেই স্থান থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় টেনে নেয়ার জন্য আবশ্যকীয় শক্তিকে বা কাজকে মৃত্তিকা পানি বিভব বলে (Water potential)। সংক্ষেপে বলা যায়, একই সমতলের বা স্থানের বিশুদ্ধ ও মুক্ত পানির তুলনায় মৃত্তিকা পানির কাজ করার শক্তি পর্যায়কে (Energy status or the ability to do work in soil relative to pure free water at the same location) মৃত্তিকা পানি বিভব বলে।

পানি বিভবের প্রকার

শক্তির উৎস ও প্রকার অনুসারে মৃত্তিকা পানির বিভবকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

১. মাধ্যাকর্ষীয় বিভব (ϕg) ;
২. চাপ বিভব (ϕp) ;
৩. মেট্রিক বিভব (ϕm) ;
৪. অভিস্রবণ বা দ্রব বিভব (ϕo) ;
৫. পানি বিভব (ϕw)।

মাটির অন্যান্য বিভবের মধ্যে রয়েছে—

১. বৈদ্যুতিক (Electrical) বিভব (ϕe) ;
২. তাপ (temperature) বিভব (ϕt) ;
৩. হাইড্রোলিক (Hydraudlic) বিভব (ϕh) ;
৪. অন্যান্য অপ্রধান বিভব–নিউমেটিক ও জলাবদ্ধতা বিভব।

মাধ্যাকর্ষীয় বিভব

পানির অবস্থানে তলের উচ্চতাজনিত প্রকৃত তল থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পানি উত্তোলনের বা আকর্ষণের মাধ্যাকর্ষীয় (Gravitational) বিভব বলে

$\phi g = \rho w \gamma Z$

এক্ষেত্রে, ρw=পানির ঘনত্ব, z = অনুভূমিক উচ্চতার (দূরত্ব)।

চাপ বিভব

চাপের তারতম্য থাকার কারণে উৎপন্ন মৃত্তিকা পানি আকর্ষণ কাজকে চাপ বিভব বলে। চাপ (Pressure) বিভব নির্ণয়ের গাণিতিক সূত্র নিম্নরূপ -

$$o\rho = Vw\Delta\rho = \frac{\Delta\phi w}{\delta\rho}\Delta\rho$$

এক্ষেত্রে,

Vw = পানির আংশিক নির্দিষ্ট (partial specific) আয়তন,
p = চাপ,
ϕw = পানি বিভব।

চাপের মধ্যে প্রধানত রয়েছে —

১. সম্পৃক্ত মাটিতে হাইড্রোলিক চাপ
২. ঝিল্লি যন্ত্রের (membrane apparatus) নিউমেটিক চাপ।
৩. উদ্ভিদ কোষের টারগর (Turgor) চাপ।

মেট্রিক বিভব

মাটির কলেয়েড বা কঠিনকার দ্রব্যের তারতম্যের কারণে উৎপন্ন পানি আকর্ষণ কাজকে মেট্রিক (Matric) বিভব বলে। মেট্রিক বিভবের গাণিতিক সূত্র হচ্ছে —

$$\phi m = Ew\Delta nw = \frac{\delta\phi w}{\delta nw}\Delta nw$$

এক্ষেত্রে, Ew = মৃত্তিকা পানি রেখার (curve) ঢাল বৈশিষ্ট্য ;
nw = পানি ভর অংশ (mass fraction)।

দ্রব বিভব

মৃত্তিকা দ্রবণ শক্তির তারতম্যের কারণে উৎপন্ন বিভবকে দ্রব বিভবকে দ্রব বিভব (Solute potential) বলে। দ্রব বিভবের গাণিতিক সূত্র নিম্নরূপ —

$$\phi s = \Sigma\pi wj\delta nj = \Sigma_j\frac{\delta\phi w}{\delta nj}\Delta nj$$

এক্ষেত্রে, j = দ্রব স্পেসিস ;
πwj = দ্রব্যের ঘনত্ব ;
nj = j দ্রব্যের ভর

পানির বিভব

সমভাবে দুটি রেফারেন্স স্থানের চাপ, মেট্রিক এবং অভিস্রবণ বা দ্রব চাপ সমন্বয়ে সৃষ্টি মোট বিভবের পার্থক্যকে পানির বিভব বলে (Water potential)। পানি বিভবের গানিতিক সূত্র নিম্নরূপ :

$$\phi w = (\Lambda\mu w)T = \phi\rho + \phi m + \phi s$$

মোট বিভব

মাধ্যাকর্ষীয় চাপ, মেট্রিক, দ্রব ও পানি বিভবসহ সকল বিভবের যোগফলে মোট বিভব (Total potential) নির্ণিত হয়। মোট বিভবের গাণিতিক সূত্র —

$$\phi T = \phi g + o\rho + \phi m + \phi s + \phi w + ...$$

২. মৃত্তিকা পানির চলাচল

মৃত্তিকার পানি ধারণ ও চলাচল (Factors effecting of soil water)

মাটিতে অনুপ্রবেশকৃত পানির একটি অংশ মৃত্তিকা কলয়েডে উপশোষিত থাকে। কিছু অংশ ক্ষুদ্রাকার কৈশিক নালীতে উপর টান প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকে কলয়েডে উপশোষণ এবং কৈশিক টান শক্তিসমূহ কার্যকর হওয়ার পর বাকি পানি পার্শ্ববর্তী মৃত্তিকার দিকে ধাবিত হয়। এভাবে মৃত্তিকা ক্রমান্বয়ে পানি সম্পৃক্ত হতে থাকে এবং অতিরিক্ত পানি মৃত্তিকার পার্শ্ববর্তী শুকনো অংশের দিকে চলতে থাকে।

মৃত্তিকা তাপের প্রভাব

অন্যান্য শক্তির ধ্রুবতা সাপেক্ষে তাপ মৃত্তিকা পানি ধারণ ও চলাচলে পার্থক্য সৃষ্টি করে। উচ্চ তাপে মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। তবে সিক্ত মাটির ক্ষেত্রে এই প্রভাব কম। মাটি শুকনো হতে থাকলে পানি বিভবে তাপের প্রভাব বেড়ে যায়।

মৃত্তিকা মেট্রিক দ্রব্যের প্রভাব

মৃত্তিকা মেট্রিক দ্রব্যের মধ্যে কলোয়েডের প্রকার ও পরিমাণের উপর মৃত্তিকা পানির আচরণ নির্ভর করে ২:১ প্রকারের সম্প্রসারণশীল কর্দম যেমন— মন্টমরিলোনাইট, স্মেকটাইট (Smectite) কর্দম অধিক পানি পরিশোষণ করে। সাধারণভাবে স্থূল বুনটের মাটির চেয়ে সূক্ষ্ম বুনটের মাটি অধিক আকর্ষণের সাথে পানি আবদ্ধ রাখে।

মৃত্তিকা দ্রব্যের প্রভাব

মৃত্তিকা দ্রবণে দ্রব্যের পরিমাণ বাড়লে পানি বিভব হ্রাস পায়।

মৃত্তিকা পানির চালাচল প্রক্রিয়া

মৃত্তিকার পানি চলাচলের প্রক্রিয়াসমূহ প্রধানত নিম্নরূপ সূত্র দ্বারা উল্লেখ করা যায় —

$Q = CDK$

এক্ষেত্রে, Q = পানির প্রবাহ গতি; C = সমানুপাতিক উপাদান;
D = পানির চালক শক্তি; K = মাধ্যমের পরিবাহিতা।

পানির চালক শক্তি (Driving force)

মাটিতে কার্যকর পানির চালক শক্তি প্রধানত তিন প্রকার যথা —

১. তাপ শক্তি : পানি উচ্চ চাপ থেকে নিম্নতর চাপের স্থানে চলিত হয়।
২. মাধ্যাকর্ষীয় শক্তি : পানি মাধ্যাকর্ষীয় শক্তি থেকে নিম্ন শক্তির দিকে চলাচল করে।
৩. কৈশিকতা বা শোষণ : পানি কম শোষণ শক্তির স্থানে চালিত হয়।

মাধ্যমিক দ্রব্যের পরিবাহিতা গুণ

মৃত্তিকার পরিবাহিতা প্রধানত পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ কমতে থাকলে পানির চলাচলে পরিবাহিতা গুণের প্রভাব কমে যায়। কোনো মৃত্তিকায় রন্ধ্র পরিসরের সংখ্যা বেশি হলে সম্পৃক্ত অবস্থায় এর পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত প্রবাহের সময় পরিবাহিতা কমে যায়।

সম্পৃক্ত প্রবাহ

মাটিতে পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ (Saturated flow) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য পয়েসুলি সূত্র ও ডারসি সূত্র অবলম্বন করা হয়।

পয়েসুলি সূত্র (Law of Poiseuille)

একটি সরু নলে পানির প্রবাহ পয়েসুলি সূত্র দ্বারা নিম্নরূপ প্রকাশ করা যায়—

$$Q = \frac{P\pi R}{8LZ}$$

এক্ষেত্রে, Q = প্রবাহের আয়তন (ঘন সেমি. / সে:, L = নলের দৈর্ঘ্য (সেমি.) ;
P = চাপ পার্থক্য (ডাইন / বর্গ সেমি.) ; R = নলের ব্যাসার্ধ (সেমি.) ;
Z = তরলের সান্দ্রতা (ডাইন / বর্গ সেমি., পয়েসেস)

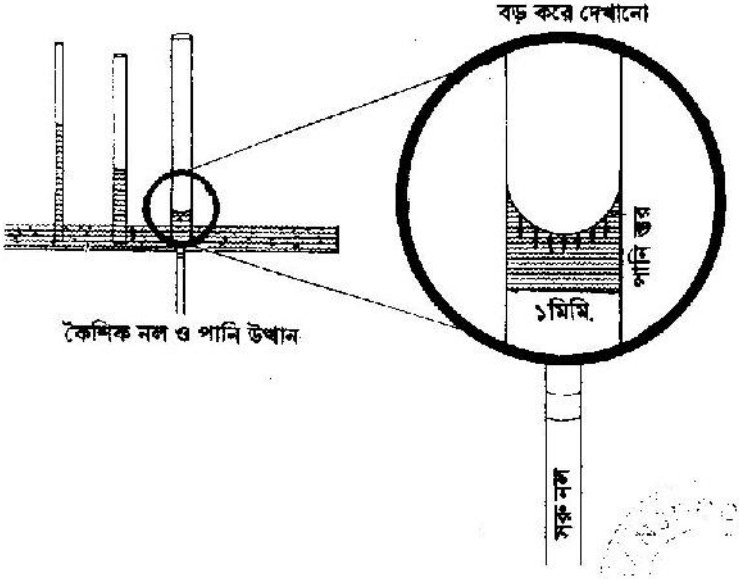

চিত্র ৪২ : সরু কৈশিক নলে পানির উত্থান

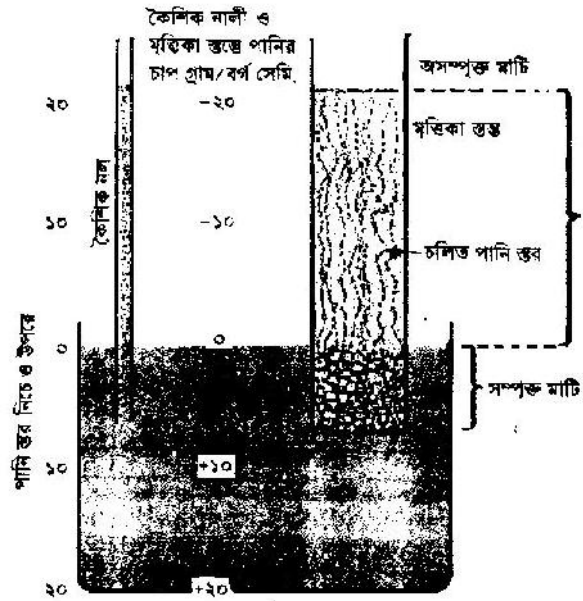

চিত্র ৪৩ : কৈশিক নল ও পানির চাপ (গ্রাম/ সে. মি.^{2})

ডারসি সূত্র (Law of Darcy)

সরন্ধ্র মাধ্যমে তরল পদার্থের প্রবাহ গতি এর প্রবাহ উৎপন্নকারী শক্তি এবং মাধ্যমের পানি (hydraulic) পরিবাহিতা গুণের সমানুপাতিক। বৈজ্ঞানিক ডারসি মাটিতে সমতাপে চালিত পর্যায়ে আর্দ্রতা প্রবাহ (Steady statisothermal moisture flow) নির্ণয়ের জন্য নিম্নরূপ সূত্র উল্লেখ করেছেন —

$$Jw = -Kw\frac{\delta\phi h}{\delta s}$$

এক্ষেত্রে, Jw = পানি প্রবাহ ঘনত্ব (water flux density)

(একক সময়ে একক আয়তনে প্রবাহিত পানিতে এর ঘনত্ব বলে (Qi / At) ;

Kw = হাইড্রোলিক পরিবাহিতা ;

$\delta\phi h/\delta s$ = হাইড্রোলিক বিভব প্রম (gradient) ;

চাপ এবং পানি উচ্চতায় পার্থক্য অনুসারে সূত্র দু'ভাবে উল্লেখ করা যায় —

(ক) চাপ পার্থক্য অনুসারে, $Q = CK\,AP/L$

এক্ষেত্রে, Q = প্রবাহ গতি (L^3T^{-1}) ; A = সরন্ধ্র মাধ্যমের প্রস্থচ্ছেদ আয়তন ;

C = আনুপাতিক ধ্রুব ; P = চাপ পার্থক্য ;

K = পরিবাহিতা ($m^{-1}L^3T$) ; L = সরন্ধ্র মাধ্যমের দৈর্ঘ্য।

(খ) পানিস্তরের পার্থক্য অনুসারে, $V = Ki$

এক্ষেত্রে, V = প্রবাহ হার (LT^{-1}) ;

K = পানি পরিবাহিতা (LT^{-1})

i = পানিস্তর পার্থক্য (hydraulic head gradient)

সম্পৃক্ত প্রবাহ বুনট অনুসারে বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি

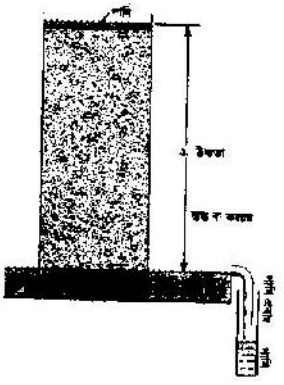

চিত্র ৪৪ : মৃত্তিকা কলামে পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ

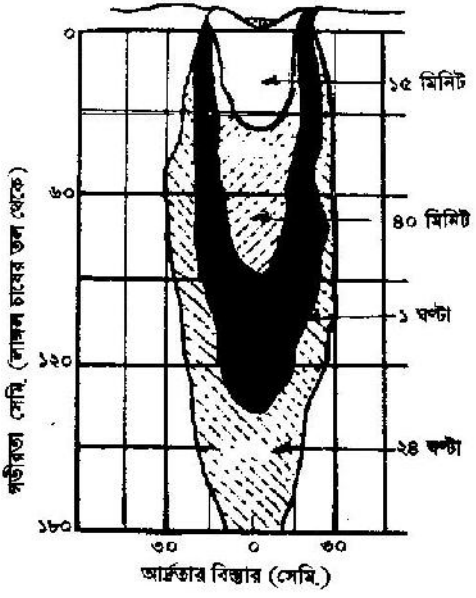

চিত্র ৪৫ : বেলে দো-আঁশ মাটিতে পানি চলাচল

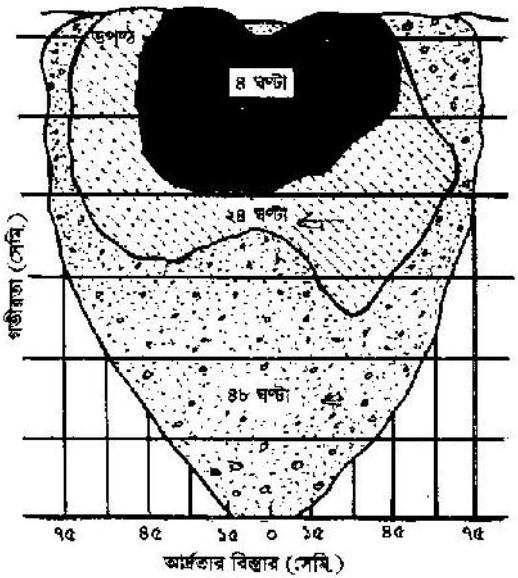

চিত্র ৪৬ : এঁটেল মাটিতে পানি চলাচল

সম্পৃক্ত প্রবাহ

মৃত্তিকা রন্ধ্রের আকার, আয়তন এবং পানি আকর্ষণের টেনশনের উপর পানির সম্পৃক্ত প্রবাহ প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। কর্ষকরি রন্ধ্র পরিসরের আয়তন কমে গেলে সম্পৃক্ত পানি প্রবাহ হ্রাস পায়। মাটিতে আর্দ্রতা কমে যাওয়ার সাথে সাথে আসঞ্জিত পানির টেনশন বেড়ে গেলে সম্পৃক্ত প্রবাহ স্তিমিত হতে থাকে।

অসম্পৃক্ত প্রবাহ (Unsaturated flow) ও বুনট

বুনট ও অধেয় আর্দ্রতা অনুসারে মাটিতে পানির অসম্পৃক্ত প্রবাহে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন–

ক. সিক্ত মাত্রায় : বেলে মাটি > দো–আঁশ > এঁটেল–মাটি ;

খ. অর্দ্র পর্যায়ে : এঁটেল মাটি > দো–আঁশ মাটি > এঁটেল মাটি ;

মৃত্তিকা পানির অপচয়

মাটিতে বিবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকা পানির অপচয় (Loss of water) সংঘটিত হয়ে থাকে, যেমন —

১. তরল অপচয় : ও উপর প্রবাহ চুয়ানি, অনুস্রবণ ;

২. বাষ্পীয় অপচয় : উপর ভূমির পানি

তরল অপচয় (Liquid loss) : মাটির উপরিভাগ দিয়ে পানি চলাচলকে উপর প্রবাহ বলে। কোনো স্থানে বা কোনো ঋতুতে বৃষ্টিপাত বেশি হলে এই প্রক্রিয়ায় পানির প্রচুর অপচয় হতে পারে। পানির পরিমাণ, মাটির অনুপ্রবেশ হার, অনুসরণ হারও মাটির ঢালের উপর প্রবাহের হার নির্ভর করে। মাটিতে অনুপ্রবেশ ও অনুসরণের হার বেশি হলে উপর প্রবাহ কম হয়। মাটির ঢাল বেশি হলে উপর প্রবাহ বেশি হয়। বেলে মাটিতে পানির চুয়ানী বেশি হয়। উপর প্রবাহ ঢাপ নির্ভর করে।

বাষ্পীয় অপচয় (Evaporation loss) : প্রাকৃতিক শক্তি যথা–তাপ, বায়ু চলাচল ও বায়ুর আর্দ্রতার প্রভাবে মাটি থেকে বা মাটির উপরস্থ পানি বাষ্পায়িত হয়। মৃত্তিকা পানি ও বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার বাষ্পীয় চাপ ও তাপের পার্থক্যের দরুন এই বাষ্পীভবন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। নিম্নলিখিত কারণসমূহের উপর বাষ্পীয় চাপ নির্ভর করে।

১. সৌর শক্তি (Radient energy)

এক গ্রাম পানি বাষ্পে পরিণত হতে প্রায় ৫৪০ ক্যালোরি শক্তি ব্যবহৃত হয়। সূর্য এই শক্তির মূল উৎস। মেঘচ্ছন্ন আকাশসম্পন্ন অর্ধ-উষ্ণ আর্দ্র অঞ্চলে বাষ্পীভবন কম। শুষ্ক অঞ্চলে বাষ্পীভবন অপেক্ষাকৃত বেশি.

২. বায়ুমণ্ডলীয় বাষ্পীয় চাপ

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানে বায়ুমণ্ডলীয় বাষ্পীয় চাপ কম-বেশি থাকলে বাষ্পীভবনও কমবেশি হয়। মেঘলা দিনে বায়ুমণ্ডলস্থ বাষ্পীয় চাপ কম হলে বাষ্পীভবনও কম হয়। শুষ্ক অঞ্চলের সেচ জমিতে বাষ্পীয়ভবন বেশি হয়।

শুষ্ক উত্তপ্ত দিনে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্তিকার উপরিভাগে বাষ্পীয় চাপ বাড়ে এবং বাষ্পীয়ভবন বৃদ্ধি পায়। রৌদ্রোজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন দিনে বায়ুমণ্ডলের চেয়ে মাটি অধিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৩. বায়ু চলাচল

শুষ্ক বায়ু চলাচলের সময় মাটির আর্দ্রতা সতত শুষে নিতে থাকে। বায়ু চলাচল বেশি হলে আর্দ্র ও শুষ্ক বায়ুর বিনিময় বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্তিকা আর্দ্রতার বাষ্পীভবন বাড়ে। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা যাই থাকুক, সামান্য বায়ু চলাচলও বাষ্পীভবন অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে।

৪. মৃত্তিকা আর্দ্রতার সরবরাহ

মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হলে বাষ্পীয়ভবন বাড়ে। আর্দ্রতা কমতে থাকার সাথে সাথে বাষ্পীভবন কমতে থাকে। মাটির মোটক বিভব বেশি হলেও বাষ্পীভবন বেড়ে যায়।

৫. পানির অনুপ্রবেশ, অনুসরণ ও ভেদ্যতা

মাটির সর্বোপরি স্তর বা তক ভেদ করে পানি অভ্যন্তরের দিকে যাওয়াকে অনুপ্রবেশ বলে। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একক আয়তনের মাটিতে এই প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ পানি প্রবেশ করে তাকে অনুপ্রবেশ হার বলে। মাটিতে অনুপ্রবেশ হার নির্ণয় ও প্রকাশের একক হচ্ছে–
সেমি/ঘণ্টা ; মিমি/ঘণ্টা ; ইত্যাদি।

মাটির কোনো নির্দিষ্ট অবস্থায় বা স্বাভাবিক অবস্থায় অনুপ্রবেশকৃত সর্বাধিক পরিমাণ এর অনুপ্রবেশ ক্ষমতা নির্দেশ করে।

পানি কর্তৃক মাটির উপর স্তর থেকে নিচে চুইয়ে যাওয়ার গুণকে ভেদ্যতা বলে (permeability)। অপর দিকে পানি কর্তৃক মাটির নির্দিষ্ট স্তর পার হয়ে নিচে চলে যাওয়াকে অনুস্রবণ (percolation) বলে।

মাটিতে পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান

মাটিতে রন্ধ্র পরিসরের আকারের উপর এবং মোট রন্ধ্র পরিসরের পরিমাণের উপর মৌলিকভাবে পানির অনুপ্রবেশ হার নির্ভর করে। রন্ধ্র পরিসরের আকার বড় হলে এবং আন্তরন্ধ্রের সংযোগ ঘনিষ্ট হলে বা রন্ধ্র পরিসর সংচলিত (continuous) হলে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পায়। পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান হচ্ছে :—

১. একক কণার বৈশিষ্ট্য

মৃত্তিকা একক কণার পরিমাপ কণার সমানুপাতিক আকার যতো বড় হবে অর্থাৎ মোট উপরায়তন যতো কম হবে অনুপ্রবেশ ততো বাড়বে। বালিকণার অনুপ্রবেশ হার সবচেয়ে বেশি।

২. মাটির বাতানুয়ন রন্ধ্রতা

মাটির বাতায়ন রন্ধ্রতা যতো বৃদ্ধি পায় অনুপ্রবেশও ততো বৃদ্ধি পায়। মাটি থেকে মাধ্যাকর্ষীয় পানি সরে যাওয়ার পর বায়ুদ্বারা পূর্ণ হওয়া রন্ধ্রের পরিমাণ থেকে বাতানুয়ন রন্ধ্রতা নির্ণয় করা যায়।

৩. মাটির সংযুক্তি

সূক্ষ্ম সংযুক্তি ও পানি স্থায়ী (water stable) দলা বা দানাদার সংযুক্তিসম্পন্ন মাটিতে সংহত (massive) মাটির চেয়ে পানি অনুপ্রবেশ হার বেশি।

৪. জৈব পদার্থ

মাটিতে পানি অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে জৈব পদার্থের প্রকার, পরিমাণ ও পচন পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ। জৈব পদার্থ স্থূল দানাবিশিষ্ট ও পরিমণে বেশি হলে অনুপ্রবেশ হার বাড়ে।

৫. অভেদ্য স্তরের গভীরতা

উপর মাটির নিচ দৃঢ় স্তর তলীয় শিলা বা অন্যান্য ধরনের অভেদ্য স্তর থাকলে অনুপ্রবেশ কমে যায়। সংযুক্তি একই ধরনের হলেও অগভীরের চেয়ে গভীর মাটিতে পানি অনুপ্রবেশ বেশি হয়।

৬. উপস্থিত মৃত্তিকা পানির পরিমাণ

সিক্ত মাটির চেয়ে শুষ্ক মাটিতে পানি অনুপ্রবেশ বেশি।

৭. মৃত্তিকা তাপ

ঠাণ্ডা মাটির চেয়ে উষ্ণ মাটির পানি অনুপ্রবেশ হার বেশি।

৮. অনুপ্রবেশ হার

কোনো মাটিতে অনুপ্রবেশ হারকে নিম্নরূপভাবে প্রকাশ করা যায়, যেমন —

১. খুব কম (very low) : ২.৫ মি.মি./ঘণ্টা, এঁটেল মাটি।

২. কম (low) : ২.৫ থেকে ১২.৫ মি.মি./ঘণ্টা অগভীর কর্দমের পরিমাণ বেশি। জৈব পদার্থ কম।

৩. মধ্যম (medium) : ১২.৫ থেকে ২৫ মি.মি./ঘণ্টা, পলি ও দো-আঁশ মাটি।

৪. উচ্চ (high) : ২৫ মি.মি./ঘণ্টা, গভীর বালি পুঞ্জীভূত পলি দো-আঁশ, পতিত কৃষ্ণ কর্দম (virgin black clays) যার মধ্যে প্রচুর পানি স্থায়ী দশা রয়েছে।

৯. পানি অনুপ্রবেশ ক্ষমতা (Infiltration)

কৃষি জমির পানি অনুপ্রবেশ ক্ষমতা ৫ থেকে ৫০ মি.মি./ঘণ্টা হয়ে থাকে। অনুপ্রবেশ ক্ষমতা এঁটেল মাটিতে সবচেয়ে কম এবং দো-আঁশ বালিতে সবচেয়ে বেশি। দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটির অনুপ্রবেশ ক্ষমতা সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ মি.মি./ঘণ্টা।

১০. মাটির ভেদ্যতা (Permeability)

কোনো তরল বা বায়বীয় পদার্থ মাটি স্তরের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সহজতাকে ভেদ্যতা বলে। ভেদ্যতা মৃত্তিকা পানির একটি চলাচল সম্পর্কিত গুণ। কোনো মৃত্তিকা পার্শ্বচিত্রে পানি ও বায়ু চলাচলের পরিমাণ ও হার বিষয়টি ভেদ্যতা দ্বারা ধারণা করা হয়। মাটির এ ধরনের গুণ বা ধর্ম প্রকাশের জন্য অনেক সময় পানি সঞ্চালন ও পানি পরিবাহিতা (conductivity) শব্দগুলিও ব্যবহার করা হয়।

মৃত্তিকা পার্শ্বচিত্রের রন্ধ্র পরিসরের আকার, পরিমাণ ও বিতরণের উপর মাটির ভেদ্যতা নির্ভর করে। মাটিতে স্থূল রন্ধ্রের পরিমাণ যতো বেশি হয় ভেদ্যতা ততো বাড়ে, তা একক কণার আকার বড় হওয়ার জন্যই হোক বা উন্নত দানাদার সংযুক্তির জন্যই হোক।

সারণি ১০ : মাটিতে ৩০ সেমি. গভীরতায় বুনটভেদে পানির পরিমাণ*

বুনট	ন্যূব্জ		মাঠ ক্ষমতা		প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা	
	%	সেমি.	%	সেমি.	%	সেমি.
বেলে দো-আঁশ	৩.৪	১.৫	১১.৩	৫.০	৭.৯	৩.৬
দো-আঁশ	৬.৮	৩.০	৯৮.১	৮.১	১১.৩	৫.১
এঁটেল দো-আঁশ	১০.২	৪.৬	২৯.৫	৯.৭	১১.৩	৫.১

* উৎস : ওয়াটার, ইয়ারবুক অব এগ্রিক, USDA ১৯৫৫।

১০ নং সারণি থেকে জানা যায় যে, মাটির কুনট ভারী হওয়ার সাথে সাথে নুয়াঙ্ক ও মাঠ ক্ষমতা পর্যায়ের পানি বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রাপ্য পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না।

১১. অনুস্রবণ (Percolation)

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে এবং মাটির রন্ধ্র পরিসরের প্রভাবে মৃত্তিকা স্তরের মধ্য দিয়ে নিচের দিকে পানি চালিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনুস্রবণ বলে। মৃত্তিকা আর্দ্রতায় আকর্ষণ ১ বারের কম থাকলে পানি অনুস্রবণ সংঘটিত হয়। অনুস্রবণ পানির এক প্রকার সম্পৃক্ত প্রবাহ। শুষ্ক মাটিতে পানি অনুপ্রবেশ দ্বারা সম্পূর্ণ স্তর সিক্ত হওয়ার পর অনুস্রবণ শুরু হয়। পানির অনুপ্রবেশ বাড়লে অনুস্রবণও বাড়তে থাকে।

লাইসিমিটার পরীক্ষা দ্বারা অনুস্রবণ হার নির্ণয় করা যায়। সিউয়েজ ট্যাঙ্কের পরিশোষণ এলাকা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মাটির অনুস্রবণ তাৎপর্যপূর্ণ। মাটিতে যথানিয়মে গর্ত করে জমা হওয়া পানির পরিমাণ থেকেও পানির অনুস্রবণ জানা যায়।

(ক) অনুস্রবণ ও চুয়ানী

কোনো স্থানের বা ঋতুতে পরিমাণ মাটির মাঠ ক্ষমতার বেশি হলে পানির অনুস্রবণ সংঘটিত হয়। প্রধানত বৃষ্টির পরিমাণ বা তীব্রতা এবং মাটির ক্ষমতার উপর অনুস্রবণের হার নির্ভর করে। অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাষ্পীভবন, ফসলের উপস্থিতি এবং নিকাশ সুবিধা।

(খ) অনুস্রবণ–বাষ্পীয়ভবণ সমতা (Balance)

বৃষ্টিপাতের পর প্রাপ্ত পানির প্রবাহ, সংরক্ষণ এবং অনুস্রবণ প্রক্রিয়ার পারস্পরিক অংশগ্রহণ প্রধানত মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। আর্দ্র অঞ্চলে বছরে ৪ থেকে ৬ মাস সময়ে বাষ্প প্রস্বেদনের চেয়ে পানির অনুপ্রবেশ হার বেশি ঘটে এবং অনুস্রবণের চেয়ে বাষ্পীভবন বেশি হয়।

১২. উদ্ভিদে বৃষ্টি ফোঁটার প্রতিরোধজনিত (Interception) বাষ্পীয় অপচয়

ফসলসম্পন্ন জমিতে বনাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সকল পানি মাটিতে পৌঁছায় না। বৃষ্টি, শিশির ও বরফের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গাছের পাতা ও কাণ্ডে লেগে থাকে বা আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং মাটিতে না পৌঁছেই বাষ্পাকার প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। ঘন অরণ্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক পরিমাণ এভাবে গাছে প্রতিঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে পারে। জমিতে গুল্মভিত্তিক ফসল উপস্থিত থাকলে সেখানেও এই প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাতের ১০ থেকে ১২ % পানির অপচয় হতে পারে।

৩। পানির ভোগ্য ব্যবহার (U) ও পরিমাপ

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে উদ্ভিদ দেহের প্রস্বেদন ও বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত পানি, উদ্ভিদ কোষ কলায় বিদ্যমান পানি এবং সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা থেকে বাষ্পাকারে অপচয়িত পানির মোট পরিমাণকে পানির ভোগ্য ব্যবহার বলে। বাষ্প প্রস্বেদনের সাথে ভোগ্য পানির পরিমাণের একটি প্রধান

পার্থক্য হচ্ছে যে, ভোগ্য পানি ব্যবহারের ফসল উদ্ভিদে বিদ্যমান পানি ধরা হয়, কিন্তু বাষ্প প্রস্বেদনে তা ধরা হয় না।

পানির ভোগ্য ব্যবহার = প্রস্বেদন + বাষ্পায়ন + উদ্ভিদ পানি

বাষ্প প্রস্বেদন = প্রস্বেদন + বাষ্পায়ন

পানি ব্যবহার দক্ষতা

একক পরিমাণ শুকনো দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভিদ মোট (প্রস্বেদন, বৃদ্ধি বাষ্পায়ন ও নিকাশ অপচয়সহ) যে পরিমাণ পানি ব্যবহার করে তাকে পানি ব্যবহার দক্ষতা বলে। উদ্ভিদের প্রস্বেদন অনুপাত কমলে পানি দক্ষতা বাড়ে। একক পরিমাণ শুকনো দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ পানি ব্যবহৃত হয় তাকে প্রস্বেদন অনুপাত বলে।

পানি ব্যবহার দক্ষতার সূত্র—

$$EU = 100\frac{Wv}{Wd}$$

এক্ষেত্রে, Wv = ব্যবহৃত পানি ; Wd = সরবরাহকৃত পানি।

সারণি ১১ : ফসল সহগ (Kc)

ফসল	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগ.	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.
আউশ	—	—	—	১.১	১.১৫	১.২০	১.০	—	—	—	—	—
রোপা আমন	—	—						১.১		১.১৫	১.৩	১.০
বোরো	১.১৫	১.২৫	১.০	—	—	—	—	—	—	—	—	১.০
গম	১.১৫	০.২	—	—	—	—	—	—	—	—	০.৫	০.৭৫
গোল-আলু	১.২০	০.৭৫	০.৫৫	—	—	—	—	—	—	—	০.৫	০.৭০

উৎস : BARC, ১৯৮২

প্রস্বেদন হার

উদ্ভিদের পানি পরিশোষণের পর এর অংশবিশেষ সর্বদাই পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে বের হয়ে যায়। বাষ্পীভবনের অনুরূপ সৌর শক্তি, বায়ুর বাষ্পীয় চাপ তাপ, বায়ু চলাচল ও গতিবেগ এবং মৃত্তিকা আর্দ্রতা দ্বারা প্রস্বেদন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। মাটিতে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য যথা-প্রকার, সংখ্যা, বয়স, শিকড়ের গভীরতা এবং বিস্তৃতি দ্বারা প্রস্বেদন কাজ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। গভীর বিস্তৃত মূলতন্ত্র, বড় ও অধিক সংখ্যক পাতাবিশিষ্ট ফসলের উপস্থিতি প্রস্বেদনের হার বাড়ায়।

বাষ্প প্রস্বেদন (ET) হার

যৌথভাবে মৃত্তিকা উপরিভাগ থেকে এবং উদ্ভিদ পাতার মাধ্যমে যে পরিমাণ পানি বের হয়ে যায় তাকে বাষ্পপ্রস্বেদন বলে। পূর্বে বর্ণিত বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের উপাদানের সমন্বয় বাষ্পপ্রস্বেদন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়

বাষ্প প্রস্বেদন (Evapo transpiration)

কোনো জমিতে জন্মানো ফসল উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের ব্যবহৃত এবং উক্ত জমির মাটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বাষ্পায়িত পানির মোট পরিমাণকে বাষ্প প্রস্বেদন বলে। এর সূত্র হচ্ছে—

ET (Crop)=KCPET

এক্ষেত্রে, ET(Crop)=ফসলের বাষ্প প্রস্বেদন ;

KC= ফসলাঙ্ক ;

PET=প্রচ্ছন্ন বাষ্পপ্রস্বেদন।

প্রচ্ছন্ন বাষ্প প্রস্বেদন

পর্যাপ্ত আর্দ্রতাসম্পন্ন কোনো জমির সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং মৃত্তিকা আচ্ছাদনকারী ফসল কর্তৃক বাষ্প প্রস্বেদনকে প্রচ্ছন্ন বাষ্প প্রস্বেদন বলে। এর সূত্র হচ্ছে—

PET=C[W.Rn+(I-W). F(u). (ea-ed)] mm/day

এক্ষেত্রে, W = তাপ সংশ্লিষ্ট উপাদান ;

Rn = প্রকৃত সৌর রশ্মি মি.মি./দিন ;

F(u) = বায়ু সংশ্লিষ্ট উপাদান ;

ea-ed = গড় বায়ু তাপে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ও বায়ুর প্রকৃত বাষ্পচাপ (মিলি বার)।

আবহাওয়া তথ্য থেকে ET নির্ধারণের প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে—

১. রূপান্তরিত পেনমেন (Penman) পদ্ধতি
২. ব্লেনি ক্রিডল (Blaney-Criddle) পদ্ধতি
৩. থর্নথয়েট (Thornthwaite) পদ্ধতি
৪. খ্রিশ্চিয়ানসেন (Christiansen) পদ্ধতি

রূপান্তরিত পেনমেন পদ্ধতি

সুবিধা ও অসুবিধা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পর ডুরেনবস এবং প্রুইট (Doorenbos and Pruitt) ১৯৭৫ সনে পেনমেন পদ্ধতির একটি রূপান্তর প্রস্তাব উল্লেখ করেন। পদ্ধতির রূপান্তরিত পেনমেন পদ্ধতি নামে পরিচিত মূল প্রস্তাবটি বিজ্ঞানী পেনমেন ১৯৪৮ সনে উদ্ভাবন করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে ET পরিমাপের সূত্র হচ্ছে—

ETc = W. Rn +(i-W).F(u) (ea - ed)mm/day

এক্ষেত্রে, ETc = রেফারেন্স ফসলের ET মি.মি./দিন ;

W = তাপ সম্বন্ধীয় উপাদান ;

ea = সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ (মিলি বার) গড় বায়ু তাপে সে: ;

ed = বায়ু প্রকৃত গড় বাষ্প চাপ মিলি বার ;

Rn = প্রকৃত সূর্য রশ্মি ;

$F(u)$ = বায়ু চলাচল উপাদান ;

$$ed - ea \times \frac{RH \text{ গড়}}{১০০} ;$$

এক্ষেত্রে, RH = আপেক্ষিক আর্দ্রতা।

ব্লেনি-ক্রিডল পদ্ধতি (Blaney-Cridle System)

বিজ্ঞানী ব্লেনি ও ক্রিডল ১৯৫০ সনে তাপ ও দিবস দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ভোগ্য পানি বা ET নির্ধারণের একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। সূত্র হচ্ছে

$$U = KF = \Sigma Kf = \Sigma u = \Sigma \frac{ktp}{100}$$

এক্ষেত্রে, U = ফসলের ভোগ্য পানি, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, (সেমি.) ;
F = ভোগ্য পানি উপাদনের সমষ্টি (গড় তাপ ও দিবস দৈর্ঘ্য) ;
(U) = মাসিক ভোগ্য পানি (সেমি.) ;
K = ঋতুভিত্তিক ভোগ্য পানি ব্যবহার সহগ ;
k = মাসিক ভোগ্য পানি ব্যবহার সহগ ;

$$f = t \times \frac{P}{100} ;$$

t = গড় মাসিক তাপ (সে :) ;
p = মাসিক দিবস দৈর্ঘ্য বার্ষিক দিবস দৈর্ঘ্যের ২ ।

বাষ্প প্রস্বেদনের পরিমাপ

সরাসরি বাষ্প প্রস্বেদন পরিমাপ করার জন্য নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা যায় ; যেমন–

ক. লাইসিমিটার (Lysimeter) পদ্ধতি
খ. মাঠ পরীক্ষণ (Experimental) পদ্ধতি
গ. মৃত্তিকা আর্দ্রতা অপচয় (Depletion) পর্যবেক্ষণ
ঘ. পানি ভারসাম্য (Balance) পদ্ধতি
ঙ. ইন্টিগ্রেশন পদ্ধতি (Integration system)
চ. ইনফ্লো–আউট ফ্লো পদ্ধতি (In-flow out flow system)

১. লাইসিমিটার পরীক্ষা পদ্ধতি

বড় পাত্র বা লাইসিমিটারে ফসল জন্মিয়ে ফসল উদ্ভিদ দ্বারা পরিশোষিত বা অপচয়িত পানির পরিমাণ নিরূপণ করে বাষ্প প্রস্বেদন নির্ধারণ করা হয়। যে পদ্ধতিতে কোনো আয়তনের মাটিতে তৎপার্শ্ব অবস্থা থেকে পানি আচরণ সংক্রান্ত বিষয়ে পৃথক পরিবেশের ফসল জন্মানো হয়, তাকে লাইসিমিটার পদ্ধতি বলা হয়। লাইসিমিটার প্রধানত দুপ্রকার ; যথা —

ক. বিনা–ওজনকরণ প্রকার (Non-weighing type)
খ. ওজনকরণ প্রকার (weighing type)

স্বল্পকালীন সময়ের ফসলে সঠিক বাষ্প প্রস্বেদন তথ্য পাওয়ার জন্য ওজনকরণ প্রকার, লাইসিমিটার অধিক উপযোগী।

সঠিকতার সাথে ফসলের ভোগ্য পানির পরিমাণ বাষ্প-প্রস্বেদন নির্ধারণের জন্য লাইসিমিটার পদ্ধতি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে ; যথা —

ক. প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান রাখার পরিস্থিতি ;

খ. মৃত্তিকার গুণজনিত সীমাবদ্ধতা (ট্যাংকের মাটি ও জমির মাটি) ;

গ. ট্যাংকের আকার আকৃতি ;

ঘ. পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ;

ঙ. পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

উল্লেখ্য, ট্যাংক একই ফসলের জমিতে স্বাভাবিকভাবে বসানো উচিত

ওজনকরণ প্রকৃতির লাইসিমিটারের ফলাফল অধিকতর বিশ্বস্ততা ও সুযোগের অভাবে তা সবসময় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। বর্তমানকালে মেরিওট পদ্ধতিতে (Mariotte system of water supply) ট্যাংক থেকে ফসলের ভোগ্য পানির সহজ উপায়ে নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে সাময়িকভিত্তিতে (periodic) ফসলের পানি ব্যবহার নির্ণয় করা যায়। কাঁচের গজ (gauge) দ্বারা দৈনিক বা সাপ্তাহিকভাবে দ্বি-আবরণের মধ্যস্থানের পানির স্তরের উঠানামা এবং পানি সরবরাহ থেকে মেরিওট পদ্ধতিতে পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়।

২. মাঠ পরীক্ষা প্লট পদ্ধতি

লাইসিমিটার পদ্ধতির চেয়ে মাঠ পরীক্ষা প্লট পদ্ধতি অধিকতর সঠিক। ফসলী জমিতে পানি সেচ, বৃষ্টিপাত ও পানি অপচয়, নিয়ন্ত্রণ করে বা সমতা রক্ষা করে এই পরীক্ষা করা হয়। যে পরিমাণ পানিতে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে ভোগ্য পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, প্রথমে পানির পরিমাণ বাড়নোর সাথে সাথে ফলন বাড়তে থাকে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা পার হয়ে গেলে ফসলের ফলন পুনরায় না বেড়ে কমতে শুরু করে। মাঠ পরীক্ষা প্লট পদ্ধতিতে গভীরভাবে অনুস্রাবিত পানি (percolated water) নির্ণয় করা যায় না বলে পানির পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে পারে।

মৃত্তিকা আর্দ্রতা পরীক্ষা

এই পদ্ধতিতে জমিতে পানি সেচের আগে ও পরে মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় করা হয়। এজন্য সময়ে সময়ে জমি থেকে নমুনা নিয়ে একাধিকবার আর্দ্রতা নির্ণয় করতে হয়। জমির মাটি বিষম না হলে এবং ভূ-গর্ভ পানি থাকলে এই পদ্ধতিতে ফসলের ভোগ্য পানির পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। জমি থেকে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া নমুনার আর্দ্রতার অপচয় থেকে গ্রাফ অঙ্কন করে প্রাত্যহিক ভোগ্য পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

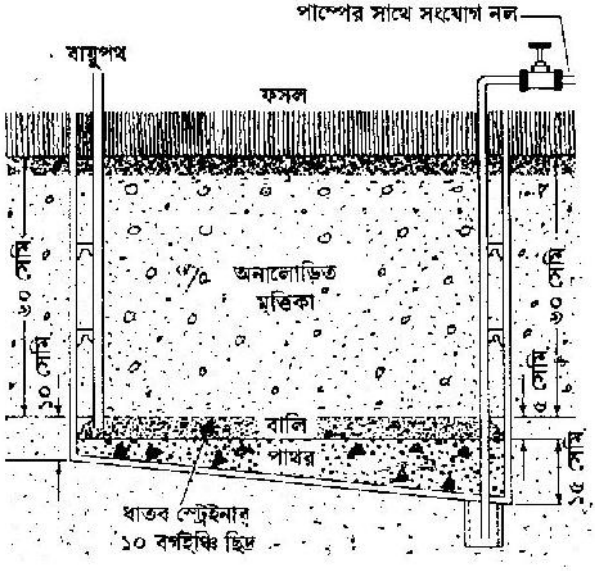

চিত্র ৪৭ : মাঠ টেনসিওমিটারের কাঠামো

মৃত্তিকা আর্দ্রতা পরিমাণ

মৃত্তিকা আর্দ্রতা পরিমাপের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এরমধ্যে কয়েকটি প্রধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো —

সমটান বা টেনসিওমিটার পদ্ধতি

টেনসিওমিটার যন্ত্র দ্বারা সমটান পদ্ধতিতে আর্দ্রতা নির্ণয় করা হয়। টেনসিওমিটার যন্ত্রের (চিত্র ৪৮) প্রধান প্রধান অংশের মধ্যে রয়েছে সচ্ছিদ্র কর্দম কাপ, একটি সরু নল ও গজ বা মনোমিটার। মাটিতে পানি শুকিয়ে যেতে থাকলে টেনসিওমিটার যন্ত্রের সচ্ছিদ্র কাপের নলের পানি বের হয়ে গিয়ে ঋনাত্মক শোষণ চাপ বা টান (tension) সৃষ্টি করে। এই টান সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য ভ্যাকোয়াম গজের কাঁটা ও পারদ মেনোমিটারের পারদ উপরে উঠে আসে। টেনসিওমিটার প্রধানত দুপ্রকার যথা - (ক) ভেকোয়াম টেনসিওমিটার এবং (খ) পারদ টেনসিওমিটার

টেনসিওমিটার পদ্ধতির সুবিধা

১. সহজে, অল্প সময়ে ও সরাসরি মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় করা যায়;
২. বেলে মাটির আর্দ্রতা নির্ণয় সঠিক হয়;
৩. মাঠে তাৎক্ষণিকভাবে আর্দ্রতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়;
৪. টেনসিওমিটার বসানোর এবং আর্দ্রতা রেখা তৈরির পর আর্দ্রতা নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

টেনসিওমিটার পদ্ধতির অসুবিধা

১. টেনসিওমিটার পাঠ থেকে আর্দ্রতা নির্ণয় করতে হলেও চুল্লী-শুকনো পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় বলে এটি ব্যয়সাধ্য ;
২. অত্যন্ত শুকনো নুয়াক্ষ বা সিক্ত মাটির সম্পৃক্ত আর্দ্রতা ফলাফল নির্ভুল হয় না ;
৩. সরু নলে বায়ু প্রবেশ করলে ফলাফলের সঠিকতা বিনষ্ট হয়, উচ্চ আকর্ষণ মাপা যায় না ;
৪. ভ্যাকোয়াম গজ বা মেনোমিটার যন্ত্রের সামান্য গোলযোগই ফলাফলের সঠিকতা নষ্ট করে ।

পারদ টেনসিওমিটারের চেয়ে ভ্যাকোয়াম গজ টেনসিওমিটারের গঠন সরল। টেনসিওমিটার বসানোর পূর্বে প্রস্তুতি কাজও সহজ। এতে পারদের প্রয়োজন হয় না। আর্দ্রতা নির্ণয় অল্প সময়ে সমাধা করা যায়। এর অসুবিধার মধ্যে রয়েছে পানির অতি উচ্চ আর্দ্রতা নির্ণয় অল্প সময়ে সমাধা করা যায় না। সচ্ছিদ্র সিরামিক কাপে পানির সাথে অন্যান্য দ্রব্য প্রবেশ করলে যন্ত্রের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পদ্ধতি

এই পদ্ধতির অপর নাম রেজিস্টেন্স ব্লক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বা রেজিস্টেন্স ব্লকের কার্যকারিতার প্রধান নীতি হচ্ছে যে, মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে গেলে বিদ্যুৎ

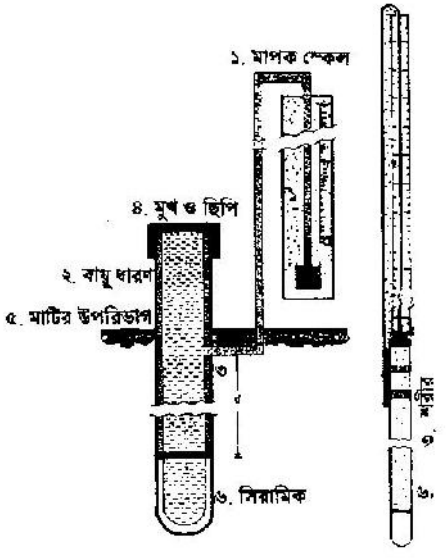

চিত্র ৪৮ : মারকারি টেনসিওমিটার

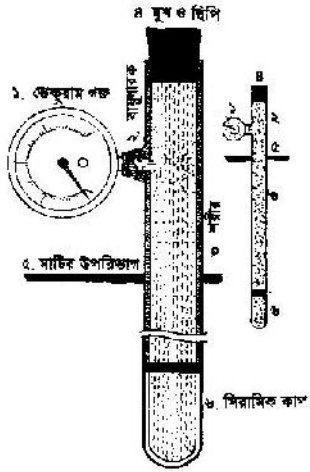

চিত্র ৪৯ : ভ্যাকুয়াম গজ টেনসিওমিটার

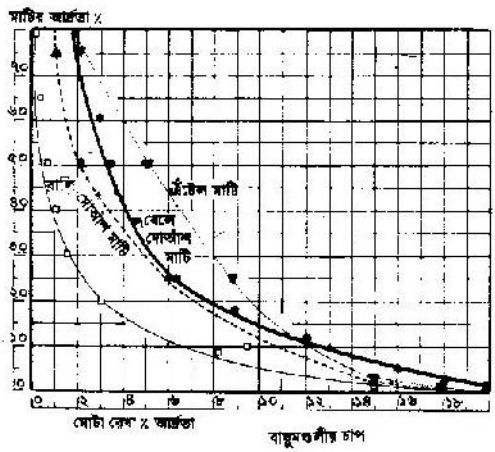

চিত্র ৫০ : মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণের বার টেনশন রেখা

পরিবাহিতাও কমে যায়। ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক বিজ্ঞানী জিপসাম ব্লকের প্রচলন করেন। এই ব্লকের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে মৃত্তিকা সংযোগে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তা একটি রূপান্তরিত হুইটস্টোন ব্রিজ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। তার ফলাফল কেলিব্রেশন করে মাঠ ক্ষমতা থেকে নুয়াক্ক পর্যায় পর্যন্ত মৃত্তিকা আর্দ্রতা সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

নিউট্রন বিস্তার পদ্ধতি

এই পদ্ধতির অপর নাম নিউট্রন প্রোব (Probe) এই পদ্ধতি এবং মোট ৩টি যন্ত্রাংশ রয়েছে, যেমন– নিউট্রন প্রোব ও ফাঁকা সিলিন্ডার বা নল, নিউট্রন প্রোব ধারক ও আর্দ্রতা নির্ণায়ক (counter)। নিউট্রন প্রোব দণ্ডাকার, ব্যাস প্রায় ৫ সেমি.। অপর প্রান্ত কাউন্টারের সাথে সংযুক্ত করা হয়। আর্দ্রতা নির্ণয়ের উদ্দিষ্ট জমিতে প্রথমে একটি ফাঁকা সিলিন্ডার বসিয়ে সিলিন্ডারের ভিতরে প্রোব প্রবেশ করানো হয়। প্রোব প্রবেশ করানোর মিনিটের মধ্যেই কাউন্টারের আর্দ্রতার হিসাব নির্ণীত হয়ে যায়। কাজ সম্পাদনের পর প্রোব রেখে দেওয়া হয়।

চিত্র ৫১ : নিউট্রন প্রোব যন্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণ

প্রেসার প্লেট পদ্ধতি

মাটির আর্দ্রতা নির্ধারণ জন্য প্রেসার মেমব্রেন যন্ত্র (Perssure membrane apparatus) খুব উপযোগী। তুলনামূলকভাবে শুকনো মাটির আর্দ্রতাও এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। প্রেসার প্লেট দ্বারা মাটির ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্য থেকে মাটিতে বিদ্যমান আর্দ্রতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৪। মৃত্তিকা পানির ব্যবস্থাপনা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অনুকূলে প্রাকৃতিক অরণ্য ভূমি পরিষ্কার করা হলে মাটি থেকে পানি ভূপৃষ্ঠের আশঙ্কা বেড়ে যায়। উপর প্রবাহ, অনুস্রবণ বাষ্পায়ন এবং বাষ্পপ্রস্বেদনের হার

বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকা থেকে পানির অপচয় কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত করে। সঠিক পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করলে পানির অপচয় হ্রাস করা যায়।

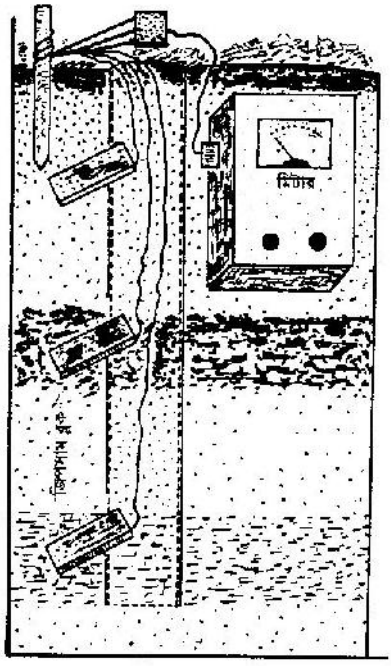

চিত্র ৫২ : জিপসাম ব্লক দ্বারা মৃত্তিকা আর্দ্রতা নির্ধারণ

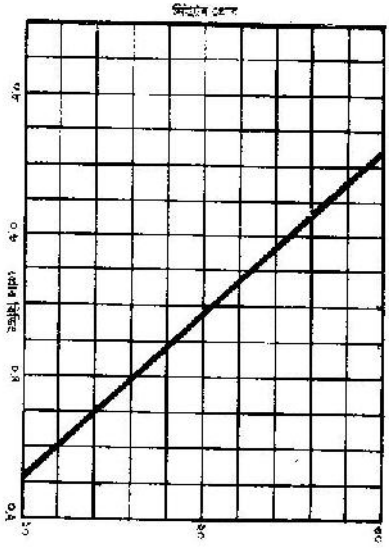

চিত্র ৫৩ : নিউট্রন প্রোব পাঠ রেখা

আর্দ্রতা সংরক্ষণ করা বা অপচয় রোধের উপায়

পানির উপর প্রবাহ ও বাষ্পায়ন রোধের জন্য নিম্নলিখিত উপায়সমূহ একক বা যৌথভাবে অবলম্বন করা যায়:

১. ডোরা বা স্ট্রিপ চাষ;
২. ফসল পর্যায় অবলম্বন বা উপযুক্ত ফসল চয় নীতি গ্রহণ;

৩. জাবড়াপ্রয়োগ ;
৪. ঘাস ফসলের চাষ ;
৫. অরণ্য সৃষ্টি ;
৬. উপযুক্ত চাষ কর্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার ;
৭. ধান চাষ কর্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার ;
৮. ধাপ পদ্ধতিতে বাঁধ প্রদান ;
৯. সোপান পদ্ধতির চাষ অবলম্বন ;
১০. বেঞ্চ সোপান অবলম্বন ;
১১. অতিরিক্ত পানি সরানোর ব্যবস্থা ;
১২. পুকুর ও এ জাতীয় পানি সংরক্ষণাধার নির্মাণ ;
১৩. পলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

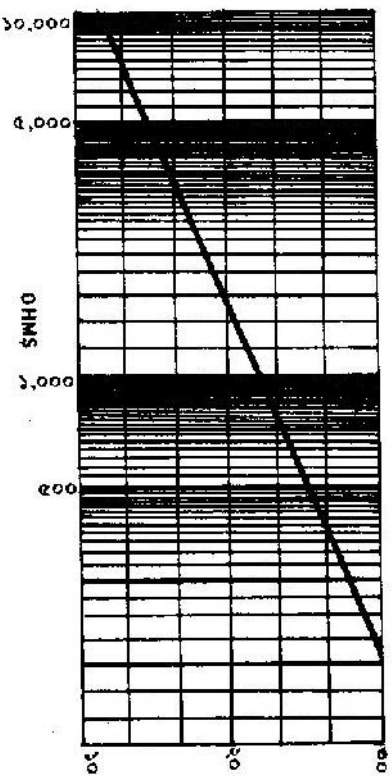

চিত্র ৫৪ : জিপসাম ব্লক পাঠ রেখা

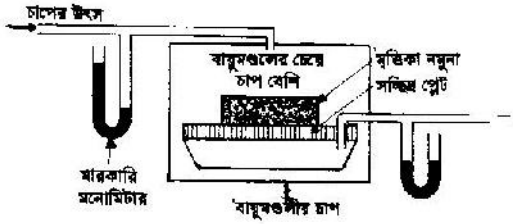

চিত্র ৫৫ : মাটির আর্দ্রতা নির্ধারণের জন্য প্রেসার মেমব্রেন যন্ত্র

১. ডোরা চাষ : ডোরা (Strip) চাষের প্রধান উদ্দেশ্য মাটিতে পানির অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে প্রবাহ কমানো। লম্বা বাঁকানো আকারের জমিতে একান্তরভাবে প্রশস্ত সারি ফসলের (যেমন–তুলা, সরগাম) পাশে ঘন সারি (যেমন–চীনাবাদাম, ডালফসল) ফসলের চাষ করা হয় (চিত্র ৫৬)। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ঘন সারি সম্পন্ন ফসলের বীজ হার সাধারণ পরিমাণের চেয়ে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে হয়। ঘন সারি ফসলের উপস্থিতির ফলে পানির উপর প্রবাহ কম হয়।

২. সুষ্ঠু ফসল চাষ নীতি প্রণয়ন : জমির জন্য মনোনীত কোনো একটি ফসলক্রমে (Crop sequence) সারি ফসল, ঘন সন্নিবিষ্ট দানা লিগিউম বা লিগিউম ঘাস মিশ্রিত ফসল থাকলে বার্ষিক পানি অপচয় কম হয়। উপযুক্ত ফসল চাষ নীতি জমিকে অধিকাংশ সময়ব্যাপী আবৃত্ত রেখে পানির উপর প্রবাহ কমিয়ে থাকে।

৩. জাবড়া প্রয়োগ : ভূমির উপরিভাগে খড়-কুটা বা অন্যান্য জৈব দ্রব্য দ্বারা জাবড়া প্রয়োগ করলে, পানির উপর প্রয়োগ করলে পানির অনুপ্রবেশ বাড়ে। এতে পানির উপর প্রবাহ এবং বাষ্পায়ন কম হয়। মাটির উপরে নাড়াজাতীয় (stubble) জাবড়া কার্যকরভাবে অনুপ্রবেশ হার বাড়িয়ে থাকে। জৈব জাবড়া দ্রব্য পচে গেলে সময়ের ব্যবধানে মাটিতে জৈব পদার্থের সরবরাহে বাড়ে।

৪. ঘাস ফসলের চাষ : ছাতার ন্যায় শাখা-প্রশাখার বিস্তার বা কেনোপি এবং নিবিড় শিকড়সম্পন্ন ঘাসজাতীয় ফসলে মাটিতে পানির অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে উপর প্রবাহ কমিয়ে রাখে। যে ফসল জমিতে নানা কারণে অন্যান্য ফসল ভাল জন্মে না সেখানে ঘাসজাতীয় ফসল জন্মিয়ে পানির অপচয় রোধ করা যায়।

৫. বনাঞ্চল সৃষ্টি : বন্যার স্থানে বনাঞ্চল করে পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব। এতে পরোক্ষভাবে ভূমির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়।

৬. যান্ত্রিক বা কারিগরি পদ্ধতি অবলম্বন : জমির ঢাল অনুসারে নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করে পানির প্রবাহ কমানো যায়। পরিকল্পিত কারিগরি অবকাঠামো দ্বারা পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করলে কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৭. কন্টোর চাষ (Contour) : পাহাড়িয়া এলাকায় ধাপ পদ্ধতিতে চাষ করলে মৃত্তিকা পানির উপর প্রবাহ হ্রাস পায় (চিত্র ৫৭)। পাহাড়িয়া উঁচু নিচু এলাকায় ধাপসমূহ সমতলভাবে তৈরি করা হয় বলে অনুপ্রবেশ উৎসাহিত হয়।

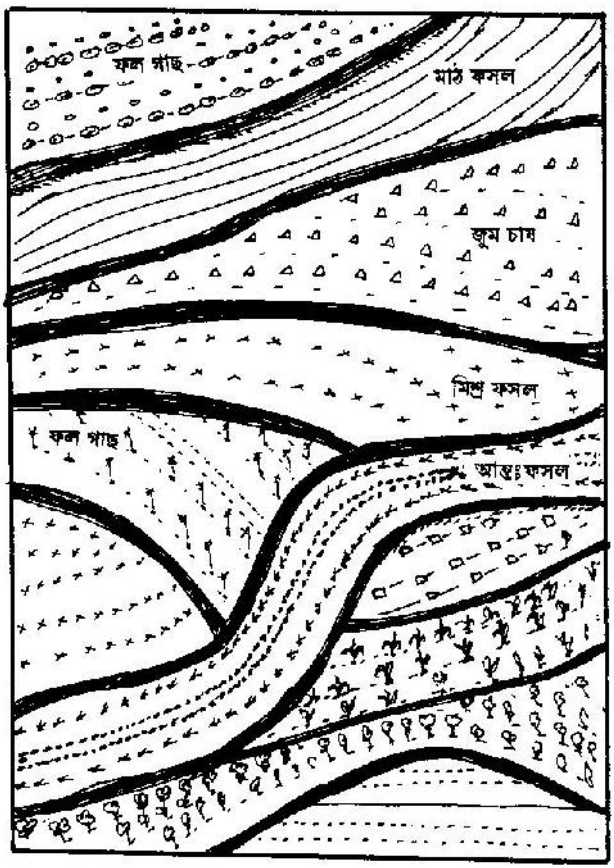

চিত্র ৫৬ : দো-আঁশ মাটির পাহাড়ী ঢালে ডোরা চাষের মাধ্যমে সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৮. কন্টোর বাঁধ (Contour bund) : পাহাড়িয়া এলাকায় ঢাল অসমতল ও বিচ্ছিন্ন খণ্ড হলে ধাপ চাষ সহযোগে সেখানে ধাপ বাঁধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ধাপ বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রতিটি উঁচু-নিচু স্থানে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পেয়ে অপচয় কম হয়।

৯. ধাপ সোপান চাষ (Terrace) : পানির অপচয় নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষের কার্যকারিতা কন্টোর চাষ কন্টোর বাঁধের অনুরূপ। তবে সোপান চাষে জমি কন্টোরের চেয়ে প্রশস্ত থাকে। সোপান চাষের ক্ষেত্রে ঢালের আড়আড়ি নালা তৈরি করে পানি অপচয় কমানো হয়।

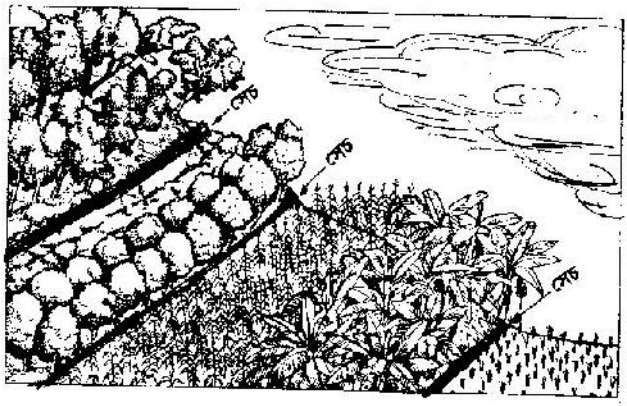

চিত্র ৫৭ : কন্টোর চাষ পদ্ধতিতে সেচপানি নিয়ন্ত্রণ

১০. বেঞ্চ (Bench) সোপান : জমির ঢাল ১৫ % এর বেশি হলে বেঞ্চ সোপান পদ্ধতিতে পানির অপচয় কমানো যায়। বেঞ্চ সোপান পদ্ধতিতে বিন্যাস করা জমিতে দূর থেকে গ্যালারির অনুরূপ দেখায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর বেঞ্চের ঢাল নির্ভর করে। বৃষ্টিপাত বেশি হলে ঢাল বাইরের দিকে থাকে এবং কম হলে ঢাল ভিতরের দিকে থাকে।

১১. অতিরিক্ত পানি সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ : বৃষ্টিবহুল এলাকায় নিকাশের জন্য জমি থেকে পানি সরানোর প্রয়োজন হয়। পানি সরানোর কাজ পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে পানির অপচয় হ্রাস পায়।

১২. বাষ্প প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রণে জাবড়া ব্যবহার : সর্বদা ব্যবহৃত জাবড়ার মধ্যে কাঠের গুড়া, জৈব সার, খড় পাতা ও গো-শালা লিটার উল্লেখযোগ্য। বাড়ির আশেপাশের বাগানে বা ফল গাছের গোড়ায় জাবড়া প্রয়োগ দ্বারা পানির বাষ্প প্রস্বেদন কমিয়ে আনা যায়। আধুনিককালে বিশেষভাবে তৈরি কাগজ ও প্লাস্টিক শিট দিয়ে তৈরি দ্রব্য দ্বারা ও মাটির উপরে আবরণ দিয়ে পানির বাষ্পায়ন কমানো হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পানি সেচ

১। পানি সেচের গুরুত্ব

ফসল উৎপাদনের জন্য ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বা জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি প্রয়োগকে পানি সেচ বলা হয়। এক টন চিনি ভুট্টা উৎপাদনের জন্য প্রায় এক হাজার টন পানির বাষ্পায়ন ও প্রস্বেদন হয়।

একইভাবে প্রতি টন গম, ধান বা তুলা উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে ১·৫, ৪ ও ১০ হাজার টন পানির বাষ্পপ্রস্বেদন হয়। এই পানি মূলত মাটি থেকে আসে। মাটিতে পানি না থাকলে বা কম থাকলে সেচের মাধ্যমে তা সরবরাহ বা ঘাটতি পরিপূরণ করতে হয়।

সারণি ১২ : বিশ্বের কয়েকটি দেশের চাষযোগ্য জমি ও সেচকৃত জমির পরিমাণ

দেশ	সেচকৃত জমি (মিলিয়ন হেক্টর)	জমির শতকরা ভাগ
মিশর	--	১০০
চীন	৭৫	৭০
পাকিস্তান	১২	৬৫
তাইওয়ান	--	৫৮
জাপান	৪	৫০
ইন্দোনেশিয়া	৪	৪০
ইরাক	৪	৩৫
ইরান	৫	৩০
ভারত	৩৫	১৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৮	৮
অস্ট্রেলিয়া	৩	২

উৎস: USDA, FAER NO. 98, 1978. ফ্রেমজি ও মহাজন, ১৯৬৯ এবং অন্যান্য উৎস অনুসরণে

২। সেচ পানির ব্যবহার

সেচের পানির উৎস ও উৎপাদন ক্ষমতা

সেচের পানির মূল উৎস বৃষ্টিপাত। কোনো কোনো উত্তরাঞ্চলীয় দেশে তুষারপাতও আংশিকভাবে সেচপানির উৎস হিসেবে কাজ করে। বৃষ্টিপাতের পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদিতে জমা হয় বা চলাচল করে। এসব পানির অংশবিশেষ হিসেবে ভূ-নিম্ন স্তরে প্রবেশ করে এবং বাষ্পায়িত হয়।

সারণি ১৩ : বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্পের নাম ও সেচাধীন জমির পরিমাণ

সেচ প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)
১. গঙ্গা–কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প (জি কে প্রজেক্ট)	১,৪০,০০
২. বরিশাল সেচ প্রকল্প (বি আই পি)	১,০৬,০০
৩. ভোলা সেচ প্রকল্প	৫২,০০০
৪. ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প	৪৬,০০০
৫. চাঁদপুর সেচ প্রকল্প (সি আই পি)	২৯,০০০
৬. মুন্সুরী সেচ প্রকল্প (এম আই পি)	২৭,০০০
৭. পাবনা আই. আর. ডি	২৫,০০০
৮. মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	১৭,০০০
৯. কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (কে আই পি)	১৮,০০০
১০. ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পসমূহ (প্রায় শতাধিক)	প্রতি টি<১০০০
১১. স্থানীয় সেচ উদ্যোগসমূহ (কয়েক হাজার)	প্রতিটি < ১০০
১২. পাওয়ার পাম্প অগভীর নলকূপ	প্রতিটি < ২৩
১৩. স্থানীয় যন্ত্রপাতিভিত্তিক সেচ (সংখ্যা অনেক বেশি)	প্রতিটি খুব কম

সেচের জন্য অবস্থান অনুসারে স্থির ও চলমান উৎস পানির উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা –ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভ। ভূ-পৃষ্ঠ পানিকে পুনরায় দু' ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — চলমান উৎস ও স্থির উৎস। স্থির উৎসের মধ্যে রয়েছে, পুকুর, বিল, হ্রদ, ইত্যাদি। মাটির নিচের জমায়িত পানি বা ভূ-পৃষ্ঠসহ পানিও সেচ কাজে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এবং অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় সেচযোগ্য পানির স্তর অপেক্ষাকৃত উপরে রয়েছে। সেচের জন্য ভূ পৃষ্ঠ পানির উৎস কম, সেখানে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচ দেওয়া যায়।

সেচের জন্য পানির উৎস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পানি সেচের সহজতা, ব্যয়, উপযোগিতা, সেচ পানির গুণাগুণ, যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা উপযুক্ততা, সকলই পানির উৎসের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভূ-গর্ভ পানির চেয়ে ভূ-পৃষ্ঠ পানির সাহায্যে সেচ প্রদান সহজ। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য থাকে (যেমন— লোহা, বোরন, লবণ) যা মাটির গুণাবলী বিনষ্টের কারণ হতে পারে। ভূ-পৃষ্ঠ পানির মধ্যে জোয়ার প্রাপ্ত নদীর পানি বা সামুদ্রিক পানিতে পর্যাপ্ত লবণ থাকে। প্রবাহমান নদ-নদীর পানি ঘোলা হতে পারে বিল বা ডোবার পানির জৈব অক্সিজেন চাহিদা (BOD) বেশি হতে পারে।

সেচের পানি সংগ্রহ

সেচপানি সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে —

১. **বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ :** কৃত্রিম বাঁধ জলাশয় সংরক্ষণকারী ধাপ বাঁধ এবং পুন খননকৃত নদী-নালায় পানি সংরক্ষণ করে ফসলের সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়

২. **সামুদ্রিক পানি লবণমুক্তকরণ :** স্বাদু পানির অপর্যাপ্ততায় সামুদ্রিক পানি রাসায়নিকভাবে পরিশোধন বা লবণমুক্ত করে সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

৩. **বরফ সংগ্রহ :** বরফ অঞ্চল থেকে বরফ সংগ্রহ করে সেই পানির সাহায্যে সেচ দেওয়া যায়।

৪. **সেচপানির পুন:ব্যবহার :** সেচকৃত জমি থেকে প্রাকৃতিকভাবে নিষ্কাশিত পানি সংগ্রহ করে পুনরায় সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়।

৫. **কৃত্রিম বৃষ্টিপাত :** আধুনিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সেচ চাহিদা পূরণ করা যায়।

৬. **শহর বন্দরের পানি :** শহর বন্দরের ব্যবহৃত পানি নলের সাহায্যে সংগ্রহ করে তা দিয়ে পানিসেচ দেওয়া যায়।

সেচ-পানির উৎপাদন ক্ষমতা

একক পরিমাণ পানি দ্বারা সেচ দেওয়ার ফলে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ থেকে সেচ-পানির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। সেচ-পানির উৎপাদন ক্ষমতা প্রধানত ফসলের প্রকার ও জাত, মৌসুম, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, রোপণ, সময়, রোগ-পোকার আক্রমণ মাত্রা, ভূমিকর্ষণ ও সেচ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে ফসলের মধ্যে ধানের জমিতে সেচ-পানির উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা কম। গমের জমিতে উৎপাদন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি (সারণি ১৪)। দানা ফসলের মধ্যে সরগম, বাজরা ও ভুট্টার সেচপানির উৎপাদন ক্ষমতা মোটামুটি মধ্যম। ধানের জমিতে সেচপানির উৎপাদন ক্ষমতা কম হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) পানি প্রয়োগজনিত অপচয়, (২) অধিক আগাছা, (৩) মৃত্তিকা সম্পৃক্ত রাখার জন্য অধিক পরিমাণ পানি প্রয়োগ এবং (৪) অধিক বাষ্পায়ন অপচয়।

সারণি ১৪ : একক পানির পরিমাণ ও ফসলের উৎপাদন*

ফসল	পানি প্রয়োজনীয়তা (সেমি.)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	পানির উৎপাদন ক্ষমতা (কেজি/হেক্টর সেমি.)
ধান	১২০	৪৫০০	৩·৭
সরগম	৫০	৪৫০০	৯·০
বাজরা	৫০	৪০০০	৮·০
ভুট্টা	৬৩	৫০০০	৮·০
গম	৪০	৫০০০	১২·৫

উৎস : দক্ষিণামূর্তি ও অন্যান্য (১৯৭১)

৩। সেচের পানি পরিমাপ

কার্যকরভাবে সেচের পানি ব্যবহার করতে হলে পানির স্তরের সঠিক পরিমাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য ও বিদ্যমান পানির পরিমাণ জেনে ফসলের জন্য কেবল অবশিষ্ট অংশ প্রয়োগ করলেই চলে। এজন্য প্রয়োগতব্য পানির পরিমাণ বা পানি প্রবাহের পরিমাণ জানতে হয়।

সেচের পানি পরিমাপের তত্ত্ব হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত করে সময়ের সাথে প্রবাহিত পানির পরিমাণ নির্ণয় করা। সেচের পানি পরিমাপের প্রধান প্রধান উপাদান হচ্ছে,

১. পরিমাপ কাঠামোর প্রস্থচ্ছেদ এলাকা;
২. একক সময়ে সেচপানি প্রবাহের গতি।

পানি পরিমাপের একক

সাধারণত দুই অবস্থায় পানি পরিমাপ করা হয়, যেমন—

১. স্থিতিশীল অবস্থায় (Static) পরিমাপ
২. চলতি অবস্থায় (Running) পরিমাপ

সংরক্ষণাধার, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে গ্যালন, লিটার ঘনফুট, ঘন মিটার, হেক্টর সেমি., একর ইঞ্চি, একর ফুট ইত্যাদি এককের সাহায্যে পানি পরিমাপের বিষয় উল্লেখ করা হয়। চলতি অবস্থায় স্রোত ধরা নদী–নালা, খাল ও নলে পানি পরিমাপ করা হয়। পানির প্রবাহ মাপার একক হচ্ছে —

গ্যালন/মি: ; লিটার/সে: ; ঘনফুট/সে: ; একর ইঞ্চি/ঘণ্টা ; একর ফুট/দিন এবং হেক্টর সেমি./মি:। সাধারণভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি এককের রূপান্তর নিচে দেওয়া হলো —

১ ঘনফুট = ৭.৪৮ ইউ. এস. গ্যালন/সে : = ৬.২৩ ইম্পেরিয়াল গ্যালন/ সে :
= ৪৪৮.৮ (প্রায়) ইউ. এস. গ্যালন / মি:
= ৬৪৬, ২৭২ ইউ. এস. গ্যালন / দিন
= ০.৯৯১৮ (প্রায়) একর ইঞ্চি/ঘণ্টা

১ একর ফুট = ৪৩৫৬০ ঘনফুট
= ৩২৫, ৮৫০ ইউ. এস. গ্যালন।

১ ইউ. এস. গ্যালন = ২৩১ ঘন ইঞ্চি
= ১ ঘনফুট পানির ওজন
= ৬২.৫ পাউন্ড।

১ ইউ. এস. গ্যালন পানির ওজন = ৮.৩৬ পাউন্ড

১ ইম্পেরিয়াল পানির ওজন = ১০ পাউন্ড।

পানি পরিমাপ পদ্ধতি

পানি পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ এখানে বর্ণনা করা হলো–

১. ওয়ার (Weir) পদ্ধতি
২. ফ্লুম (Flume) পদ্ধতি
৩. অরিফিস (Orifice)
৪. নল অরিফিস পদ্ধতি
৫. বালতি বা ড্রাম পদ্ধতি
৬. ভাসমান (Floating) পদ্ধতি
৭. আয়তন পদ্ধতি
৮. হাইড্রোমিটার পদ্ধতি।

ওয়ার পদ্ধতি

সেচের পানি পরিমাপের জন্য ওয়ার পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়। কোনো স্রোতে ওয়ার কাঠামো বসিয়ে প্রবাহ মাপা যায়। ওয়ারে নির্দিষ্ট আকৃতিতে কাটা নচের ('V' notch) মাধ্যমে পানি চালিত করা হয় এবং সূত্র অবলম্বন করে প্রবাহিত পানির পরিমাপ নির্ণয় করা যায়।

ওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন —

১. আয়তাকার ওয়ার (Rectangular wier) ;
২. ট্রপিজয়ডাল (Trapizoidal) বা চিপোলেটি (Chipoletti) ওয়ার ;
৩. V নচ ওয়ার-৯০° ত্রিকোণাকার (V notch) ।

ওয়ার পদ্ধতিতে অনেকটা সঠিকভাবে পানির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ওয়ারের আকার স্রোত ধারার আকারের উপর নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির মধ্যে আয়তাকার অবকাঠামোর ব্যবহার বেশ প্রাচীন। পানি প্রবাহের উচ্চতা (head) ও ওয়ারের প্রস্থ বা ক্রেস্ট দৈর্ঘ্যের (crest length) ভিত্তিতে পূর্ব প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়।

উদ্ভাবনকারী ইটালিয়ান প্রকৌশলীর এই নামানুসারে এই চিপোলেটি ওয়ার নাম রাখা হয়। আয়তাকারের চেয়ে চিপোলেটি ওয়ারের গঠন ও স্থাপন কিছুটা কঠিন, তবে পরিমাপ পদ্ধতি আয়তাকারের ওয়ারের অনুরূপ

কম পানি পরিমাপের জন্য ৯০° ত্রিকোণাকার 'V' নচ ওয়ার অধিক উপযোগী। কারণ প্রবাহ কম হওয়াতে পানির উচ্চতা উপরে থাকে। কয়েক সেমি. থেকে সর্বাধিক ১০০ সেমি./সে: পর্যন্ত পানি এই ওয়ার দ্বারা মাপা যায়। ক্ষুদ্রকার বলে ত স্থানান্তর করেও ব্যবহার করা যায়। পানির পরিমাপ পদ্ধতির অন্যান্য ওয়ারের মতো।

কারেন্ট মিটার

স্রোত প্রবাহের গতি কারেন্ট মিটার যন্ত্র দ্বারা সহজেই নির্ণয় করা যায়। তারপর প্রবাহ আকার দ্বারা পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। কারেন্ট মিটার একটি ছোট আকারের যন্ত্র। এর মধ্যে

একটি ঘূর্ণন পাখা (rotating wares) রয়েছে স্রোতের গতি নিয়ন্ত্রিত এই পাখার ঘূর্ণন সংখ্যা থেকে প্রবাহের গতি নির্ধারণ করা যায়

ফ্লুম (Flume)

কোন স্থানের প্রবাহের গতি পরিমাণগত ওয়ার দ্বারা মাপার জন্য যথেষ্ট না বলে মাঝখানে সরু কাঠামো সম্পন্ন ফ্লুম তৈরি করা যায়। ফ্লুমের মধ্যে পার্শাল ফ্লুমের ব্যবহার অধিক। ফ্লুম কাঠামো এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে সংকুচিত অংশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত না হয়।

পার্শাল ফ্লুম একটি আধুনিক ধরনের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অবকাঠামো তৈরি জটিল বলে উপযুক্ত প্রকৌশলী ব্যতীত এর ডিজাইন, প্রস্তুত এবং স্থাপন করা ঠিক নয়। এই পদ্ধতির ব্যয় বেশি অবশ্য ওয়ার পদ্ধতির চেয়ে কম হেডসম্পন্ন পানি পার্শাল ফ্লুম দ্বারা পরিমাণ করা যায়। পানির উচ্চতা ও পূর্ব নির্মিত তালিকা থেকে এই পদ্ধতিতে পানি প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

অরিফিস

পানির প্রবাহ হার ও উচ্চতা বা হেড যথেষ্ট না হলে অরিফিস পদ্ধতি সাহায্যে সেচের পানি পরিমাণ করা হয়। অরিফিসের গোলাকার ছিদ্রের ধারাসমূহ ধাতু দ্বারা খুবই মসৃণ করে তৈরি করতে হয়

ভাসমান বস্তু পদ্ধতি

স্রোত ধারায় কোনো বস্তু ভাসিয়ে দিয়ে পানি প্রবাহ গতি পরিমাণ করে উক্ত প্রবাহের আয়তনের সাথে তা গুণ দিয়ে পানির পরিমাণ জানা যায়। এটি একটি সহজ সরল পদ্ধতি, তবে সঠিকতা তুলনামূলকভাবে কম।

আয়তন পদ্ধতি

কোনো জলাধারে রক্ষিত বা অবস্থানরত পানি বা নদী নালায় কোনো এক সময়ে অবস্থানরত পানি এগুলোর গড় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা থেকে পানির পরিমাণ নির্ণয় করতে হয়।

হাইড্রোমিটার পদ্ধতি

কোনো সময়ে মাটিতে অবস্থানরত পানির পরিমাণ মৃত্তিকা হাইড্রোমিটার (Soil hydrometer)যন্ত্রের যাহায্যে মাপা যায়। মাটিতে বিভিন্ন গভীরতায় আর্দ্রতা পরিমাণ করে তারপর মাটির মোট পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়
পানি সেচ পদ্ধতির বিবরণ

জমির প্রকার, ফসল ও ফসল জাত, পানির উৎস ও পরিমাণ ইত্যাদি অনুসারে পানিসেচ পদ্ধতি বহু ধরনের হতে পারে। নিচে কৃষি জমিতে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান পানিসেচ পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হলো।

মুক্ত প্লাবন পদ্ধতি

জমিতে কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত পানি সেচ দিলে তাকে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতির পানিসেচ বলে। এ পদ্ধতির পানিসেচ অত্যন্ত প্রাচীন। এতে প্রচুর পানি অপচয় হয়। অবশ্য পানির প্রাকৃতির উৎস থাকলে সেচজনিত ব্যয় কম হয়। চেক বেসিন বা আইলবদ্ধ প্লাবনে জমির অংশ বিশেষে আইল বেঁধে পানিসেচ দেওয়া হয়। জমির উভয় দিকে আইল বেঁধে উপর থেকে নিচের দিকে পানি দিলে তাকে বর্ডার স্ট্রিপ বলে।

পানিসেচ পদ্ধতি

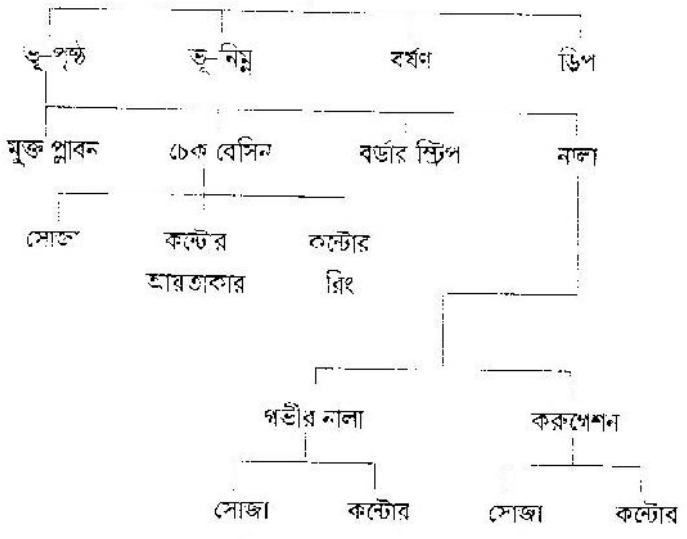

আইলবদ্ধ বা চেক বেসিন পদ্ধতি

পানি সেচের জন্য চেক বেসিন (Check basin) পদ্ধতি বেশ সহজ সরল। এই পদ্ধতিতে সমস্ত মাঠকে ঢাল অনুসারে ছোট ছোট খালায় বিভক্ত করে আইল বাঁধা হয় এবং আইলের

ভিতরে সেচ পানি প্রয়োগ করা হয়। প্রয়োগকৃত পানি ধীরে ধীরে অনুস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটির নিম্নস্তরে প্রবেশ করতে থাকে। ধানের জমিতে সেচ দিলে বা লবণ চুয়ানোর প্রয়োজন হলে আইলের অভ্যন্তরে পানি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী সেচ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হয়।

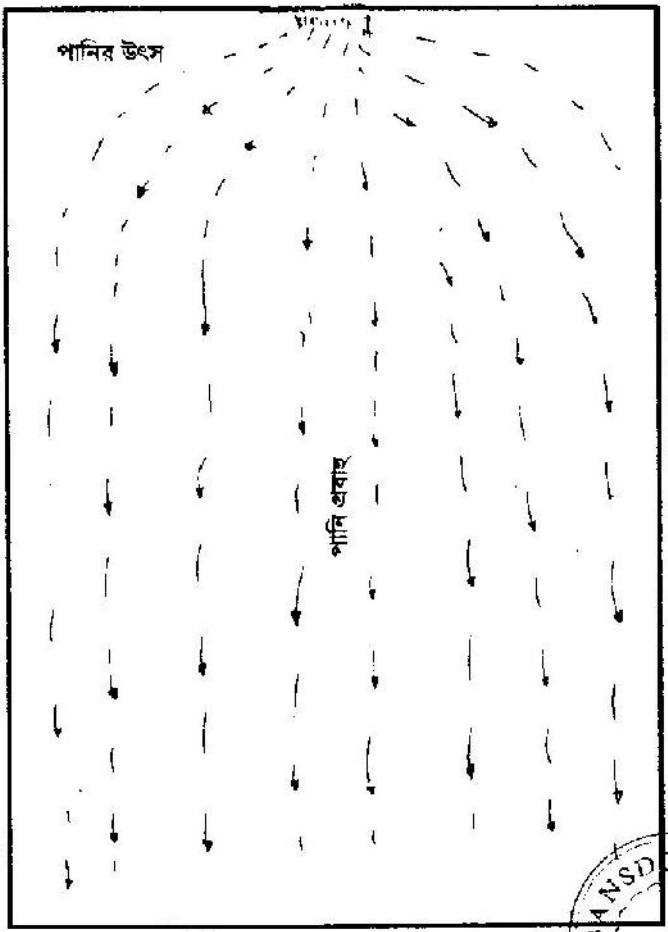

BANSDOC Library

চিত্র ৫৮ : পানি সেচের মুক্ত প্লাবন পদ্ধতি

চেক বেসিনের আকার

চেক বেসিনের আকার জমির সমতল ঢাল বা ফসলের প্রকৃতিভেদে এক বর্গ মিটার (শাক-সবজি) থেকে এক হেক্টর (মাঠ ফসল) হতে পারে। বেসিন সাধারণত আয়তাকার

হয়। ভূমির ঢাল অনুসারে চেকে বেসিনসমূহ কন্টোরও হতে পারে : কন্টোর আইলগুলো আড় আইল (cross ridges) দ্বারা যুক্ত করা হয়। আইলের উচ্চতা ফসলের পানি চাহিদা অনুসারে ৬ থেকে ৩০ সেমি. হতে পারে। যেমন গমের জন্য ৬ থেকে ১০ সেমি. এবং ধানের জন্য ২০ থেকে ৩০ সেমি. উচ্চতার আইল প্রয়োজন।

বেসিনের আকার নির্ধারণকারী অন্য একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে পানির অনুপ্রবেশ হার। অনুপ্রবেশ হার বেশি হলে বেসিনের আকার ছোট হবে। ধানের জমিতে আইলের নিয়ন্ত্রণ গেট দ্বারা আবদ্ধ পানির উচ্চতা ঠিক রাখা হয়। আইলের ভিতরে নির্দিষ্ট উচ্চতায় নল ঢুকিয়েও (নিচের দিকে) এই নিয়ন্ত্রণ সমাধা করা যায়।

ফলের বাগানে বর্গাকার চেক বেসিন বা রিঙ বেসিন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। গাছ ও সারির দূরত্ব বেশি হলে রিঙ বেসিন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ফলের বাগানে চেক বেসিনের চেয়ে গোলাকার বেসিনে পানি প্রয়োগ দ্বারা অধিক সুবিধাজনক কারণ এতে সমস্ত জমি প্লাবিত করতে হয় না।

চেক বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দেয়ার জমি ও ফসল উপযোগিতা (Suitability)

১. জমি মসৃণ (smooth) ,খুবই কম ঢাল সমান এবং সমঢাল (uniform slope) হওয়া দরকার ;

২. পানি অনুপ্রবেশ হার ধীরে থেকে মধ্যম হওয়া আবশ্যক ;

৩. সারি ফসল এবং ঘনভাবে জন্মানো মাঠ ফসলে এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যায়;

৪. সাময়িক প্লাবনে ক্ষতি হয় না এমন ফসলে (যেমন-ধান) এই পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যায় ;

৫. দানা ও ঘাস (Fodder) ফসলে মধ্যম ভারী বুনটের জমির জন্য এই পদ্ধতি উপযুক্ত ;

৬. মধ্যম গভীর শিকড় সম্পন্ন ফসলের জন্য এই পদ্ধতি উত্তম ;

৭. লবণ চুয়ানীর জন্য এই পদ্ধতি উত্তম ;

৮. ধানের জমি সেচের পদ্ধতি হিসাবে বেশি প্রচলিত ;

৯. এই পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ ও বিতরণ কার্যকারিতা বেশি।

চেক বেসিন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations)

১. পশু ও যন্ত্রের চলাচলে সেচ আইলগুলো বাধা সৃষ্টি করে ;

২. পার্শ্বনালা এবং আইলের জন্য বেশ জমি আবদ্ধ থাকে বা বিনষ্ট হয় ;

৩. ভূমির উপরিভাগের মাধ্যমে (surface drainage) পানি নিষ্কাশন বিঘ্নিত হয়।

৪. ভূমি যথেষ্ট বিন্যাস (grading and shaping) করতে হয়। তাই ব্যয়সাপেক্ষ ;

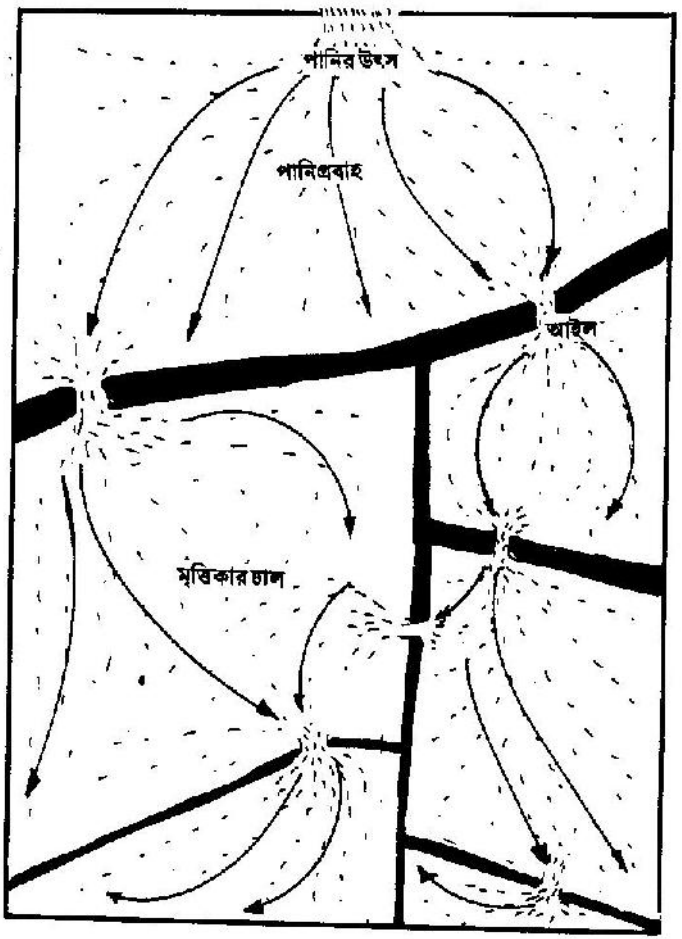

চিত্র ৫৯ : ঐটেল মাটিতে ধানের ঢালু জমিতে চেক বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ

৫. জমি প্রস্তুত, নালা ও আইল বাঁধতে প্রচুর অর্থ ও শ্রম ব্যয় হয়, (অবশ্য বেসিনের আকার বড় হলে ব্যয় কিছুটা কম হয়) ;

৬. জলাবদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ফসলে ঐটেল ধরনের মাটিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

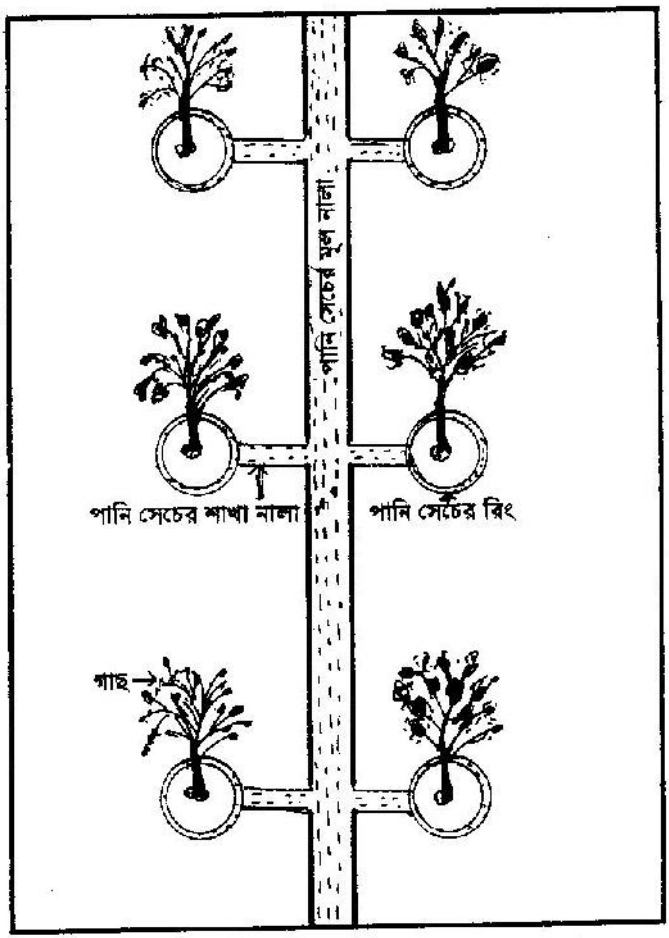

চিত্র ৬০ : দো-আঁশ মাটির ফল বাগানে রিং বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ

চেক বেসিন সেচের উদাহরণ

১৩ মি: × ১০ মি. আকারে চেক বেসিন জমি ২৫ লিটার/ সে: হারের পানি স্রোত সরবরাহ করা হলো। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ১৮% সেচের পূর্বে ফসলের শিকড় অঞ্চলের মাটিতে গড় আর্দ্রতা ছিল ৬%। মাঠ ক্ষমতায় আর্দ্রতায় উন্নতি করার জন্য উক্ত পানি স্রোত কত সময়ব্যাপী চালু রাখতে হবে? গড় শিকড় গভীরতা ১ মি: এবং সেই স্থানের মাটির আয়তনী ঘনত্ব ১.৪২ (গভীর অনুস্রবণ হওয়াজনিত পানি অপচয়ের আশঙ্কা নেই ধরে নিয়ে হিসাব নির্ণয় করতে হবে)।

সমাধান

প্রকৃত সেচ প্রয়োজনীয়তা (NIR) = আধেয় প্রাপ্ত আর্দ্রতা

= ১৮−৬ =১২%, ১২×১.৪৭ =১৭.৬৪ সেমি./ মিটার গভীরতা।

চেক বেসিন প্রয়োজনীয় পানির মোট আয়তন = বেসিনের আয়তন × প্রকৃত সেচ গভীরতা

$$= ১৩ \times ১০ \times \frac{১৭.৬৪}{১০০}$$

= ২২.৯৩২ ঘন লিটার = ২২৯৩২ লিটার

অতএব, পানি প্রেত সরবরাহ সময় $= \frac{২২৯৩২}{২৫ \times ৬০}$ = ১৫.৩ মিনিট।

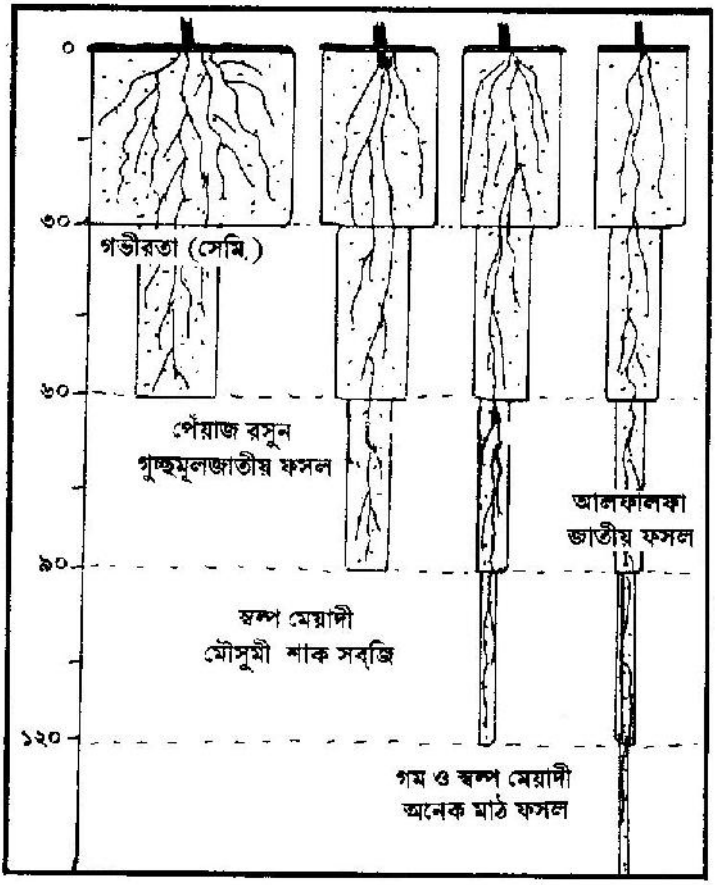

চিত্র ৬১ : মৃত্তিকা পানি ও ফসলের শিকড় গভীরতা

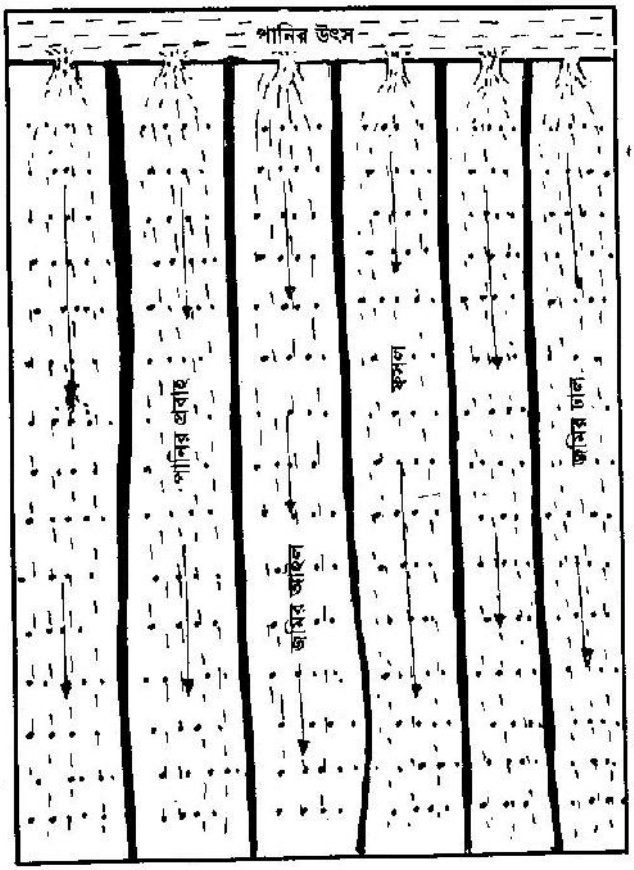

চিত্র ৬২ : পানি দো-আঁশ মাটিতে বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিতে পানিসেচ

বর্ডার পদ্ধতি

সমান্তরাল লম্বা আইলবদ্ধ জমিতে ঢাল অনুসারে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পানি সরবরাহ করলে তাকে বর্ডার স্ট্রিপ (Border strip) বলে। ঈষৎ ঢালু জমিতে বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যায়। কোনো আড় ঢাল (cross slope) থাকবে না। গম, বার্লি, ঘাস, এবং লিগিউমের ফসলের জন্য এই পদ্ধতি বেশ উপযুক্ত তবে জমাযিত পানি পছন্দকারী ধানের জন্য এই পদ্ধতি তেমন উপযুক্ত নয়।

বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধার মধ্যে রয়েছে —

১. জমি বিন্যাস সহজ, কেবল ঢালের সাথে সমন্বয় রেখে আইল প্রস্তুত করলেই হয় ;
২. সনাতন চেক বেসিন পদ্ধতির চেয়ে শ্রমিক ব্যয় কম ;
৩. জমি বিন্যাস ঠিক হলে পানির সমবিতরণ এবং উচ্চ পানি প্রয়োগ দক্ষতা অর্জন সম্ভব ;
৪. বড় পানির প্রবাহ ধারা (water stream) ব্যবহার করা যায়।

বর্ডার স্ট্রিপ জমির ঢাল অনুসারে দু'প্রকার হতে পারে, যথা–সোজা ও কন্টোর। জমির ঢাল বেশি বা অসম হলে কন্টোর বর্ডার তৈরি করতে হয়। কন্টোর বর্ডারে একটি স্ট্রিপের চেয়ে আরেকটি স্ট্রিপের উচ্চতা ৩০ থেকে ৫০ সেমি. হতে পারে।

বর্ডার স্ট্রিপ প্লটের আকার

বর্ডার স্ট্রিপ প্লটের প্রস্থ ৩ থেকে ১৫ মিটার হতে পারে। জমির ঢাল প্রকৃতি ও প্রাপ্ত পানি স্রোতের উপর নির্ভর করে ঢাল ও মাটির বুনট অনুসারে স্ট্রিপের দৈর্ঘ্য ৫০ থেকে ৩০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। মধ্যম বুনটের মাটির জন্য এই দৈর্ঘ্য ১০০ থেকে ২০০ মিটার হওয়া ভাল। জমির ঢাল হালকা বুনটের জন্য ২৫% থেকে ০.৬০%, মধ্যম বুনটের জন্য ০.২০ % থেকে ০.৪০ % এবং সব মাটির জন্য পানি স্রোতের আকার বড় হওয়া দরকার। এঁটেল মাটিতে পানি সেচ স্রোত বড় হলে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা থাকে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্ডার স্ট্রিপের দৈর্ঘ্য প্রস্থ –ঢালে কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য থাকতে পারে। বর্ডার অসামঞ্জস্য দূরীকরণের প্রধান প্রধান উপায় হচ্ছে পানি স্রোতে আকার নিয়ন্ত্রণ করা মাটি কত গভীরতায় সিক্ত করতে হবে এবং কত দ্রুত সময়ে করতে হবে তাও পানি স্রোত দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বেশি গভীরতার জন্য কম প্রবহ এবং কম গভীরতার জন্য বেশি প্রবহ দেওয়া হয়। পানির স্রোত বেশি হলে অনুপ্রবেশ সময়-সুযোগ (Infiltration opportunity time) কমে যায়। পানির স্রোত লিটার পানি/ মিটার প্রস্থ একক হিসাবে পরিমাপ করা যায়।

সারণি ১৫: মাটির ঢাল, অনুপ্রবেশ হার এবং বুনট অনুসারে পানিস্রোতের আকার

মাটির বুনট	অনুপ্রবেশ হার (সেমি. / ঘণ্টা)	বর্ডার ঢাল (%)	পানিস্রোত
বেলে মাটি	২.৫	০.২ – ০.৪	১০–১৫
		০.৪–০.৬	৭–১০
দো–আঁশ বেলে মাটি	১.৩ –২. ৫	০.২ – ০.৪	৭–১০
		০.৪–০.৬	৫–৮
বেলে দো–আঁশ মাটি	১.২ –১. ৮	০.২ – ০.৪	৫–৭
		০.৪–০.৬	৪–৬
এঁটেল দো–আঁশ মাটি	০.৬ –১. ৮	০.১৫–০.৩	৩–৪
		০.৩–০.৪	২–৩
এঁটেল মাটি	০.২ ০. ৬	০.১–০.২	২–৪

—৭

নালা সেচ পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের নালায় পানি সেচ দেওয়া হয় ; যেমন —

নালা পদ্ধতি

সারি ফসলের জন্য নালা (furrow) সেচ একটি উত্তম পদ্ধতি। নালার আকার আকৃতি মৃত্তিকার ধর্ম, ফসলের প্রকার, সারি দূরত্ব এবং নালা তৈরি যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রাকার পানি স্রোতের মাধ্যমে ফসল সারির মধ্যে নালায় পানি দেওয়া হয়। সেচ পানি মাটিতে অনুপ্রবেশ করে পার্শ্বদিকে (lateral) ফসল শিকড়াঞ্চলে বিস্তৃত হয়। পানির প্রবাহ সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা —

১. শিকড়াঞ্চলে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা পূরণ করতে কি পরিমাণ সেচ পানি দরকার ;

২. মাটির উপরিভাগে পানির অনুপ্রবেশ হার ;

৩. পানির পার্শ্ববিস্তৃতির হার ;

সেচের নালা অনেক সময় বৃষ্টিবহুল ঋতুতে নিকাশ নালা হিসেবেও কাজ করে।

নালা সেচ পদ্ধতির উপযোগিতা

বাগান ও শাক-সবজিসহ সকল সারি ফসলে সেচ দেওয়ার জন্য নালা পদ্ধতি বেশ কার্যকর। যেমন— শাক-সবজি, গোলআলু, চীনাবাদাম, টমেটো, তামাক, তুলা, ইক্ষু, সরগাম, ভুট্টা ইত্যাদি। যে সকল ফসল সামান্য জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যার শিকড় সিক্ত পরিবেশে সহজেই ছত্রাকে সাহায্যে আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে নালা পদ্ধতির উপযোগিতা বেশি। বেলে বুনটের মাটি ব্যতীত সকল মাটিতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় । বেলে মাটিতে পার্শ্ব বিস্তৃতির চেয়ে অনুপ্রবেশ হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এই পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধার মধ্য রয়েছে —

১. নালা পদ্ধতিতে মোট জমির কেবল $\frac{1}{2}$ থেকে $\frac{1}{4}$ অংশে সেচ দিলেই চলে। ফলে মাটি কাদা হয় না বা মৃত্তিকাবরণ (soil crust) উৎপন্ন হয় না ;

২. এই উদ্ধতির সেচে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা খুবই কম ;

৩. চেক বেসিন বা বর্ডার স্ট্রিপের অনুরূপ ডিচ (ditches) এবং আইল বাঁধাজনিত কারণে এবং কোনোরূপ জমি নষ্ট হয় না বা পতিত থাকে না।

নালা পদ্ধতিতে সেচ দিতে হলে জমি ঢাল অনুসারে সমতল এবং গ্রেডিং করা দরকার যাতে নালার স্থানে পানি জমা না হয়।

গোলআলু, ভুট্টা, তুলা, প্রভৃতি ফসলে প্রতি সারির জন্য একটি নালা দেওয়া যায়। কিন্তু লেটুস, গাজর, পেঁয়াজ, ইত্যাদির কয়েক সারি পর পর একটি নালা এবং বেশি দূরত্বে লাগানো বাগানে ফসল সারির ফাঁকে একাধিক সেচ নালা দেওয়া যায়। নালার গভীরতা শাক সবজির জন্য ৭ থেকে ১২ সেমি. গাছের আকার বড় হলে নালার আকারও বড় হবে যে মাটিতে পানির অনুপ্রবেশ কম সেখানে প্রশস্ত অগভীর নালা এবং অনুপ্রবেশ হার বেশি বা নালা লম্বা হলে সরু নালা তৈরি করতে হয়। নালা সেচের প্রকার বিন্যাস অনুসারে নালা সোজা বা কন্টোর হতে পারে। আবার নালার গভীরতা এবং নালার দূরত্ব অনুসারে তা গভীর নালা এবং করুগেশন (corrugation) হতে পারে।

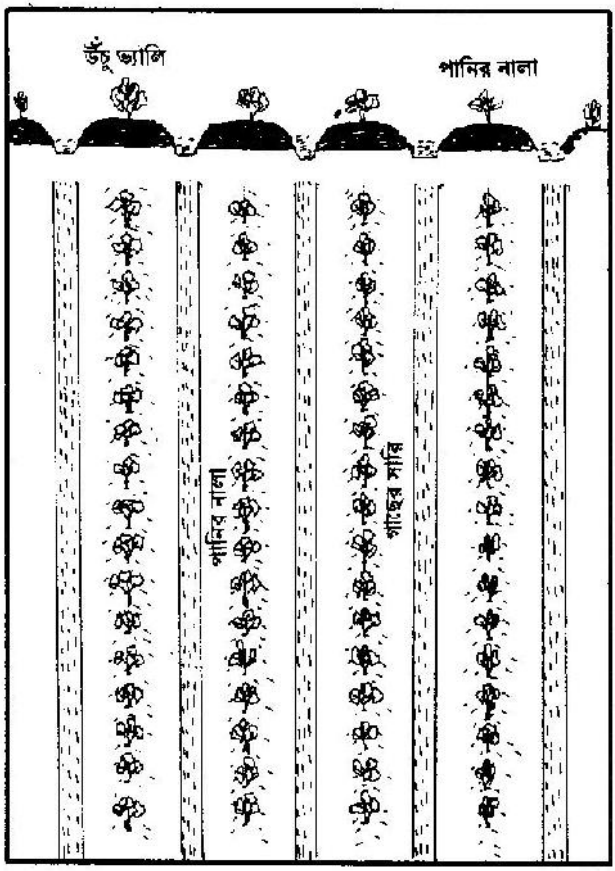

চিত্র ৬৩ : দো আঁশ ও পলি দো-আঁশ মাটিতে সবজি বাগানে নালাসেচ পদ্ধতি

সোজা নালা

জমিতে বিদ্যমান ঢাল অনুসারে লম্বালম্বি সোজা নালা (straight furrows) কাটতে হয়। এর জন্য ঢাল ০.৭৫% এর বেশি হওয়া ঠিক নয়। বৃষ্টিবহুল এলাকায় এই ঢাল ৫% বেশি হলেই ভূমিক্ষয় হতে পারে। নালায় ঢাল এবং সেচ কার্যকারিতার সাথে মৃত্তিকা গুণাবলীর সম্পর্ক প্রায় বর্ডার সেচের অনুরূপ। মাটির বুনট সুক্ষ্ম হলে অনুপ্রবেশ হার কম হয়, ফলে নালা লম্বালম্বিভাবে সমতল হওয়া দরকার। নালা পানিতে ভরে দিলে (pouling) তা ধীরে ধীরে মাটির নিচে প্রবেশ করতে থাকে।

কন্টোর নালা

কন্টোর নালায় (contour furrows) সরাসরি ঢালের দিকে নালা লম্বালম্বি না করে ঢলের আড়ে নালা কাটা হয়। জমির বন্ধুরতার সাথে মিল রেখে নালা বাঁকাও হতে পারে। বেলে মাটিতে প্রায় ৫% ঢালবিশিষ্ট জমিতে কন্টোর নালা ব্যবহার করা যায়। যে জমি চাষ করা হয় না যেমন বাগানের জমি (orchard) সেখানে ৮ থেকে ১০% ঢালেরও কন্টোর নালা পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। উল্লেখ্য, বৃষ্টিবহুল এলাকায় নালার দৈর্ঘ্য কম হওয়া উচিত। যাতে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা কম থাকে।

করুগেশন পদ্ধতি

ঢালের দিকে সরাসরি ক্ষুদ্রাকার নালায় পানি প্রবাহ ছেড়ে দিয়ে সেচ দিলে তাকে করুগেশন (corrugation) সেচ বলে। ঘন সন্নিবিষ্টভাবে জন্মানো দানা ফসলের সেচের জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার উত্তম। নিয়মিত নালা সেচের সাথে এর একটি পার্থক্য হচ্ছে যে, করুগেশন পদ্ধতিতে নালার সংখ্যা বেশি থাকে।

জমিতে বীজ বপনের পর কিন্তু অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে করুগেশন যন্ত্র দ্বারা (বীশ বা অন্যান্য যন্ত্র সম্বলিত) করুগেশন নালা তৈরি করা হয়। করুগেশন নালা 'V' বা 'U' আকারে হতে পারে। গভীরতা ৬ থেকে ১০ সেমি. নালার দূরত্ব ৪০ থেকে ৭৫ সেমি.। করুগেশন নালায় প্রবাহিত পানি সমস্ত জমি ভিজিয়ে দিলে জমির উপরে প্লাবনের অনুরূপ আস্তর সৃষ্টি হয় না। দো-আঁশ জমি যেখানে পানির পার্শ্ব চলাচলের সম্ভাবনা বেশি সেখানকার জন্য করুগেশন পদ্ধতি উত্তম। এঁটেল মাটির জন্য এই পদ্ধতি তেমন সুবিধাজনক নয়। লবণাক্ত জমির জন্যও এই পদ্ধতি উত্তম নয়। করুগেশন নালা সাধারণত ঢলের দিকে তৈরি করা হয়। স্থূল বুনটবিশিষ্ট মাটিতে ২ থেকে ৪% ঢালে নালার দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং ২% ঢাল পর্যন্ত সূক্ষ্ম বুনটের মাটিতে নালার দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

নালা সেচের হাইড্রোলিক মূল্যায়ন ও উদাহরণ

জমিতে নালা সেচের কার্যকরিতা পানির হাইড্রোলিক প্রবাহের বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। নালা সেচের পানি প্রবাহকে বর্ডার সেচের অনুরূপ ক্রমহ্রাসমান মুক্ত নালা প্রবাহ (open channel flow) বলে। প্রবাহের ধরন এবং নালায় পানি প্রবাহ প্রধানত নিম্নরূপ উপাদানের উপর নির্ভর করে—

১. নালায় প্রবেশকৃত পানি স্রোত আকার (entrance stream);
২. নালার ঢাল (furrow slope);
৩. হাইড্রোলিক প্রতিরোধ, সিক্ত ভূমির উপরিভাগের মসৃণতা (smoothing) এবং নালায় পানির অনুপ্রবেশ সুযোগ সময় এমন হওয়া দরকার যাতে ফসলের শিকড়াঞ্চলে দ্রুত প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বা পানি পৌঁছে।

নালা সেচ মূল্যায়ন

নালায় পানির অনুপ্রবেশ বিষয়টি নালা সেচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। মাটিতে অনুপ্রবেশ নির্ণয়ের পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো —

নির্ধারণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে নালাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের জন্য পারশাল ফ্লুম (parshall flume) বা সমধরনের যন্ত্র দ্বারা পানি প্রবাহ মাপা হয়। বিভিন্ন স্থানের নালায় ক্রস সেকশনাল প্রোফাইলও (cross sectional profile) মাপা হয়। নালার দূরত্ব বা এক নালার মধ্য স্থান থেকে পার্শ্ববর্তী নালার মধ্য স্থান মেপে রেকর্ড করা হয়। পানির অগ্রসর হার (rate of advance) নালার পরীক্ষার অংশে এবং প্রবাহিত পানির গভীরতা তথ্যও সংরক্ষণ করা হয়। নালায় অনুপ্রবেশের হার নিম্নরূপ সূত্র থেকে নির্ণয় করা হয় —

সঞ্চিত আয়তন অনুপ্রবেশ (Accumulated infiltration)	=	সঞ্চিত অন্তপ্রবাহ–সঞ্চিত সংরক্ষণ (Inflow - storage)
সঞ্চিত গভীরতা (depth) অনুপ্রবেশ	=	সঞ্চিত আয়তনিক অনুপ্রবেশ / পরীক্ষণ স্থানের সিক্ত এলাকা
পরীক্ষা স্থানের সিক্ত এলাকা	=	পরীক্ষা স্থানের দৈর্ঘ্য× সিক্ত পেরিমিটার (perimetes)

অন্তপ্রবাহ, সংরক্ষণ ও সিক্ত এলাকা নির্ণয়

উদাহরণ : কোনো দো–আঁশ এবং এঁটেল মাটির জমিতে নালা পদ্ধতিতে সেচ দিতে গিয়ে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া গেল। এই তথ্য থেকে সঞ্চিত অন্তপ্রবাহ, সঞ্চিত সংরক্ষণ ও সঞ্চিত সিক্ত এলাকা নির্ণয় করতে হবে।

সারণি ১৬ : দো–আঁশ ও এঁটেল মাটিতে পানি চলাচল তথ্য

তথ্য	(ক) দো-আঁশ	(খ) এঁটেল
পানি স্রোতের আকার (লিটার / মিনিট)	৯০	
দূরত্ব (মিটার)	৪৫	৪৫
অগ্রসর (সময়)	১.৮০	১.৩০
সিক্ত পেরিমিটার (সেমি.)	২৫	৩৫
নালায় ক্রস সেকশনাল এলাকা (বর্গ সেমি.)	৬০	৫০

সমাধান

১. সঞ্চিত অন্তপ্রবাহ = $\frac{\text{পানির স্রোত} \times \text{অগ্রসর সময়}}{৯০ \times ১.৮ = ১৬২ \text{ লিটার (ক)}}$

$৯০ \times ১.৩ = ১১৭$ লিটার (খ)

(নালার ক্রস সেকশনাল এলাকা×দূরত্ব)

২. সঞ্চিত সংরক্ষণ = ৬০ × ৪৫০০ = ২৭০০০০ ঘন সেমি. বা ২২৫ লিটার (ক)
৫০ × ৪৫০০=২২৫০০০ ঘন সেমি. বা ২২৫ লিটার (খ)

৩. সঞ্চিত সিক্ত এলাকা = সিক্ত এলাকা × দূরত্ব
(Accumulated wetted area)
২৫ × ৪৫০০ = ১১২৫০০ সেমি. (ক)
৩৫ × ৪৫০০ = ১৫৭৫০০ ঘন সেমি. (খ)

অনুপ্রবেশ হার নির্ণয়

উদাহরণ : দো-আঁশ মাটির কোনো পরীক্ষা নালা থেকে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া গেল। এই তথ্য থেকে পানির অগ্রসর সময়ের ভিত্তিতে সঞ্চিত আয়তনিক অনুপ্রবেশ এবং সঞ্চিত অনুপ্রবেশ গভীরতা নির্ণয় কর। পানি স্রোত ৯০ লিটার / মিটার।

সারণি ১৭ : অনুপ্রবেশ হার নির্ণয়ের প্রদত্ত তথ্য

দূরত্ব (মিটার)	অগ্রসর সময় (মিনিট)	সিক্ত পেরিমিটার (সেমি.)	নালা ক্রসসেকশনাল এলাকা (বর্গসেমি.)
১০	১·৮	২৬·০	৬০
৩০	৫·৯	২৬·২	৯৫
৫০	১১·০	২৬·৮	১০৫
৭০	১৮·০	২৭·০	১১০
৯০	২৪·০	২৭·৪	১১৫
১১০	২৮·০	২৭·৮	১১৭

সারণি ১৮ : অনুপ্রবেশ হার নির্ণয় সমাধান

দূরত্ব (মিটার)	সঞ্চিত অন্তপ্রবাহ (লিটার)	সঞ্চিত সংরক্ষণ (লিটার)	সিক্ত এলাকা (বর্গ সেমি.)	সঞ্চিত আয়তনিক অনুপ্রবেশ (লিটার)	সঞ্চিত অনুপ্রবেশ গভীরতা (সেমি.)
১০	১৬২	৯০	২৬০০০	৭২	২·৭৭
৩০	৫৩১	২৭০	৭৮৬০০	২৬১	৩·৩২
৫০	৯৯০	৪৫০	১৩৪০০০	৫৪০	৪·০৩
৭০	১৬২০	৬৩০	১৮৯০০০	৯৯০	৫·২৪
৯০	২১৬০	৮৯০	২৪৬৬০০	১৩৫০	৫·৪৭
১১০	২৫২০	৯৯০	৩০৫৮০০	১৫৩০	৫·০০

সমাধান

১. সঞ্চিত আয়তনিক অনুপ্রবেশ = (খ) – (গ) ১৬২ – ৯০ = ৭২ লিটার।
=৭২ ০০০ ঘন সেমি.

২. নালা সিক্ত এলাকা = ২৬০০০ বর্গ সেমি.

সঞ্চিত অনুপ্রবেশ গভীরতা = $\frac{(১)\ ৭২০০০}{(২)\ ২৬০০০}$ = ২.৭৭ সেমি.

সারণি ১৯ : জমির ঢাল অনুসারে নালার সাধারণ দৈর্ঘ্য (মিটার)

ঢাল %	বেলে দো-আঁশ		এঁটেল দো-আঁশ	
	পানি সেচ গভীরতা (সেমি.)			
	৫	১০	৫	১০
০.১	৯০	২৬০	২৫০	৩৪০
০.৩	২২০	৩৪০	৩৫০	৪৩০
০.৫	২০০	৩১০	৩৪০	৪৩০
১.০	১৭৫	২৫৫	২৫০	৩৪০

সেচ গভীরতা নির্ণয়

উদাহরণ

কোনো জমিতে ৬০ সেমি. পর ১০০ মিটার লম্বা নালা কাটা হলো। নালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়ার জন্য প্রারম্ভিক পানি স্রোত ছিল ২ লিটার/সে.। উক্ত পানি স্রোতের পানি নালার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে ৪৫ মিনিট সময় লাগল। তারপর পানি স্রোত কমিয়ে ১.৭৫ লি./সে. করা হলো এবং এই কাটব্যাক পানি স্রোত আরও ৫০ মিনিট রাখা হলে সেচ পানির গড় গভীরতা কত হবে?

সমাধান

এক্ষেত্রে, সেচ পানির গড় গভীরতা সমান $d = \frac{q \times ৩৬০ \times t}{W \times L}$

এক্ষেত্রে, d = সেচ পানির গড় গভীরতা,
q = পানিস্রোতের আকার (লিটার/সেকেণ্ড)
t = সেচ সময় (ঘণ্টা)
u = নালার অন্তর দূরত্ব (মিটার)
L = নালার দৈর্ঘ্য (মিটার)

প্রারম্ভিক পানিস্রোতে গড় সেচ গভীরতা $= \frac{q \times ৩৬০ \times t}{w \times L} = \frac{২ \times ৩৬০ \times ৪৫}{৬ \times ১০০ \times ৬০}$

$= \frac{৩২৪০০}{৩৬০০} = ৯$ সেমি.।

কাটব্যাক পানিস্রোতে,

$$\text{গড় সেচ গভীরতা} = \frac{০.৭৫ \times ৩৬০ \times ৫০}{০.৬ \times ১০০ \times ৬০} - \frac{১৩৫০০}{৩৮৮০} = ৩.৭৫ \text{ সেমি.}$$

অতএব, মোট গড় সেচ গভীরতা =৯.০ ×৩.৭৫ =১২.৭৫ সেমি.

সার্বিক অভূমিক্ষয়ী (non-erosive) প্রবাহ হার (flow rate) সূত্র :

$$qm = \frac{০.৬০}{S}$$

এক্ষেত্রে, qm = সর্বাধিক অভূমিক্ষয়ী প্রবাহ লি:/সে:

S=ঢালার ঢাল(২)

বর্ষণ ও ড্রিপ সেচ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে জমির উপরে বাতাসে পানি সিঞ্চন করা হয় এবং এই পানি গাছ বা মাটির উপরে পতিত হয়। বৃষ্টির মতো এই পানি নিচে পড়ে বলে একে বর্ষণ সেচ বলা হয়। চাপা বদ্ধ পানি নজলের মাধ্যমে ছড়া হয় বলে বর্ষণ সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিতে পানিসেচ দক্ষতা নিম্নরূপ বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

মৃত্তিকা উপযোগিতা

নিম্নরূপ বিষয়ের উপর বর্ষণ সেচের উপযোগিতা (suitability) নির্ভর করে—

১. মাটির বুনট : স্থূল বুনটের মাটির জন্য উত্তম ;
২. বন্ধুরতা : বন্ধুর মাটির জন্য উত্তম ;
৩. ফসল : প্রধানত সকল (ধান, পাট, ব্যতীত) ;
৪. অনুপ্রবেশ হার : এই পদ্ধতির জন্য পানির অনুপ্রবেশ হার ৪ মিমি/ ঘন্টা ;
৫. অন্যান্য দ্রব্য প্রয়োগ : সার, আগাছানাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যায়।

এই পদ্ধতিতে পানিসেচে সফলতা অর্জনের জন্য নজলের (nozzle) আকার পানির চাপ, বর্ষণ দণ্ডের দূরত্ব এবং পানির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সীমাবদ্ধতা

১. বায়ু চলাচল বর্ষণ সেচে অসুবিধা সৃষ্টি করে ;
২. পানি পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন ;
৩. ঢালু ও এঁটেল মাটিতে ভূমিক্ষয় হতে পারে ;
৪. প্রারম্ভিক ব্যয় অনেক বেশি ;
৫. যান্ত্রিক শক্তির ব্যয় (power investment) অনেক বেশি।

বর্ষণ সেচ প্রধানত দুই প্রকার যথা –

১. ঘূর্ণায়মান হেড পদ্ধতি (rotating head sytem)
২. সছিদ্র নল পদ্ধতি (perforated pipe system) : এতে নিম্ন চাপ ০.৫ থেকে ২.৫ কেজি/বর্গসেমি থাকে।

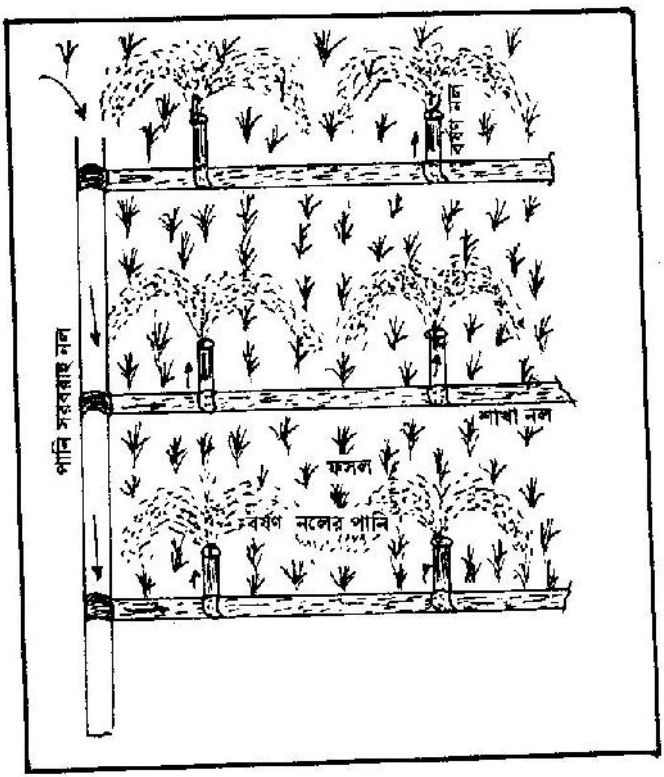

চিত্র ৬৫ : বর্ষণ পানি সেচ পদ্ধতি

পরিবহণ অনুসারে বর্ষণ সেচ যন্ত্রপাতি নিম্নরূপ হতে পারে –

১. স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতি (Portable system) : প্রধানত লাইন, পার্শ্বলাইন ও পার্শ্বসেট স্থানান্তরযোগ্য।

২. অর্ধ-স্থানান্তরযোগ্য পদ্ধতি (Semiportable system)।

৩. অর্ধ-স্থায়ী পদ্ধতি (Semipermanent system) : কেবল পার্শ্ব লাইন স্থানান্তরযোগ্য।

৪. সলিড সেট পদ্ধতি (Solid set systen) : এই পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পার্শ্বলাইন থাকায় তা স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। ঘন ঘন সেচ প্রয়োজন এমন ফসলের জন্য এই পদ্ধতি উত্তম। ফসল বোনার সময় পার্শ্ব লাইন বসানো হয় যা সারা মৌসুমেই বসানো থাকে।

৫. স্থায়ী পদ্ধতি (permanemt systen) : কোনো অংশই স্থানারন্তযোগ্য নয়।

বর্ষণ যন্ত্রের অংশ

১. প্রধান লাইন (Main line)
২. উপপ্রধান লাইন (Sub-main line)
৩. পার্শ্বলাইন (Lateral line)
৪. পাম্প সেট (Pump set)
৫. উত্তোলনী নল (Riser pipe)
৬. বিভিন্ন ব্যান্ড (Bends)
৭. ময়লা ছাঁকনি (Debris screener)
৮. পানির উৎস নল (Source pipe)
৯. কাপলার ও জয়েন্ট (Coupler and Joint)
১০. নজল (Nozzle)

বর্ষণ সেচে সার প্রয়োগের উদাহরণ

১. বর্ষণ সেচ যন্ত্রের পার্শ্ব লাইনের ১০টি সিঞ্চনকারী রয়েছে যেগুলোর দূরত্ব ১৫ মিটার। প্রধান লাইনের ১৫ মিটার পর পার্শ্বলাইন রয়েছে। জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ মাত্রা ১০০ কেজি নাইট্রোজেন/হেক্টর হলে প্রতি সেটিং সময়ে কি পরিমাণ ইউরিয়া সার দিতে হবে?

বর্ষণ সেচে সার প্রয়োগ সূত্র : $WF = \frac{Ds \times Dl \times Ns \times Wf}{10000}$

এক্ষেত্রে, WF = প্রতি সেটিং সময়ে সারের পরিমাণ (কেজি) ;
Ds = সিঞ্চনকারীর দূরত্ব (মিটার) ;
Dc = পার্শ্বলাইনের দূরত্ব (মিটার) ;
Ns = সিঞ্চনকারীর সংখ্যা।
Wf = সুপারিশকৃত সারের পরিমাণ (কেজি হেক্টর)।

এক্ষেত্রে, Ds = ১৫ মিটার; Dc= ১৫ মিটার;
Ns = ১০টি; Wf = ১০০ কেজি (N) ২৪৫ কেজি ইউরিয়া।

অতএব, $WF = \frac{১৫ \times ১৫ \times ১০ \times ২৪৫}{১০০০০} = ৫৫১$ কেজি (উত্তর)।

সারণি ২৫ : মাটির বুনট জমির ঢাল ও বর্ষণ পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ হার : (সেমি/ঘন্টা)

মাটির বুনট	ঢাল	
	০–৫%	১০–১৫%
বেলে দো-আঁশ মাটি	২.২	১.৯
পলি দো-আঁশ মাটি	১.০	০.৪
এঁটেল দো-আঁশ মাটি	০.৪	০.১

বর্ষণ ক্ষমতা নির্ণয়ের উদাহরণ

নিম্নলিখিত তথ্য থেকে বর্ষণ ক্ষমতা নির্ণয় করতে হবে

১. পানি প্রয়োগ ১.৩৫ সেমি. ঘণ্টা।

২. বর্ষণকারী লাইনের দৈর্ঘ্য ১৯০ মিটার করে ২টি।

৩. প্রতি বর্ষণকারী লাইনের ১৫ মিটার অন্তর ১৬টি।

৪. লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১৯ মিটার।

বর্ষণকারী লাইনের ক্ষমতা (Sprinkler irrigation) $q = \frac{Si \times Sm \times I}{\times ৩৬০}$

এক্ষেত্রে,

q = স্প্রিংকলারের প্রয়োজনীয় প্রবাহ (সেঃ) ;

Si = পার্শ্বদিকের স্প্রিংকলারের দূরত্ব (মিটার) ;

Sm = প্রধান লাইনের পার্শ্বলাইনের দূরত্ব (মিটার) ;

I = সর্বোত্তম পানি প্রবাহ হার (সেমি. ঘণ্টা)।

$$q = \frac{Si \times Sm \times I}{৩৬০} = \frac{১৫ \times ৯ \times ১.৩৫}{৩৬০} = ১.০৭ \text{ মি./সে. স্প্রিংকলার}$$

অতএব, সিস্টেম ক্ষমতা = ১.০৭ × ৩২ = ৩৪.২৪ লিটার/সে.।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতি

পানি সেচের জন্য ড্রিপ বা ট্রিকল (Trickle) একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। লবণাক্ত সমস্যাপূর্ণ এলাকা বা পানি অপর্যাপ্ত এলাকার জন্য এই পদ্ধতির খুবই কার্যকর। অত্যন্ত সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে গাছের এ শিকড়ের কাছে এই পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ করা যায়। কম ব্যাসার্ধবিশিষ্ট প্লাস্টিক পার্শ্বলাইন দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটির উপরে এই পানি প্রয়োগ করা হয়। এমিটার (emitter) বা ড্রিপার (dripper) যন্ত্রের মাধ্যমে পানি প্রয়োগ করা হয়। এই সেচ নিলে বেশ আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। সারির দূরত্ব কম হলে বা গাছের সংখ্যা বেশি হলে এই পদ্ধতির সেচে ব্যয় বেঁচে যায়। ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দেওয়ার সময় একই সাথে সারও প্রয়োগ করা যায়। ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ কার্যকারিতা প্রায় ৯০%।

কেবল গাছের ব্যবহারের পানিটুকু (CU) প্রয়োগ করা হয় বলে এই সফলতা অর্জিত হয়। এই সেচের প্রধান প্রধান উপকরণাংশ (components) হচ্ছে —

১. প্রধান লাইন ;

২. উপ প্রধান লাইন ;

৩. পার্শ্বলাইন ;

৪. এমিটার।

লাইনগুলো কালো PVC (Poly Vinyl Chlorde) নল দ্বারা তৈরি করা যায়। এমিটার অবশ্য PVC দ্বারা তৈরি করা যায়। এতে লোনা পানি বা সার দ্রবে নল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

নিম্নলিখিত বিষয় জানা থাকলে ড্রিপসেচে খুবই সুবিধা হয়—

১. ফসল বৃদ্ধির জন্য সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা প্রয়োজনীয়তা ;
২. ড্রিপ সেচে ফসলের পানি ব্যবহার প্রকৃতি ;
৩. সেচ ও সার প্রয়োগের যৌথ প্রভাবে ফসলের বৃদ্ধি প্রকৃতি ;
৪. সেচপানির গুণাগুণ ;
৫. সেচ ডিজাইন ও ব্যবস্থাপনা।

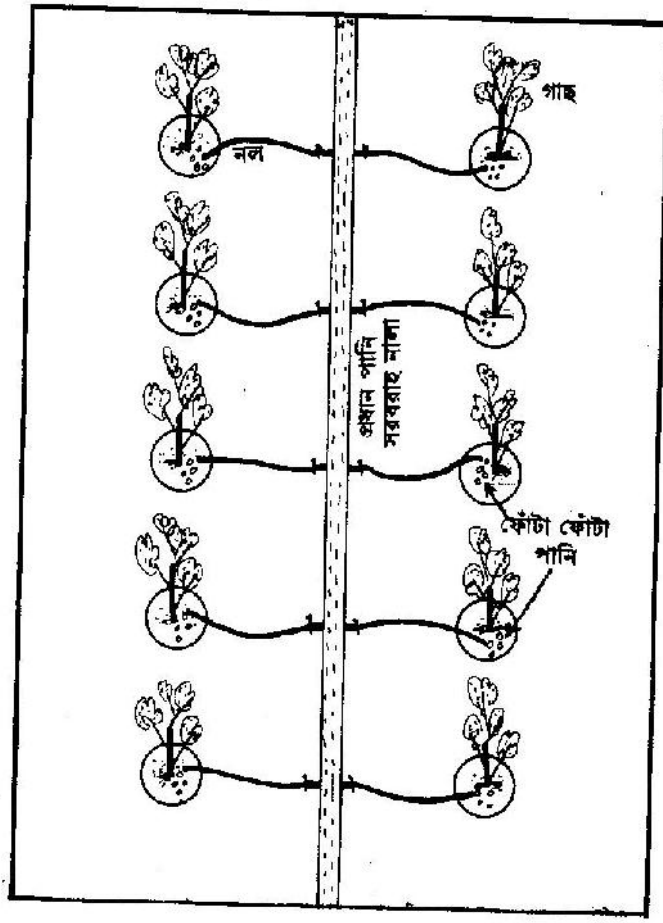

চিত্র ৬৬ : দো আঁশ মাটিতে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি

অষ্টম অধ্যায়

পানি নিকাশ

ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোনো জমিতে আটকে থাকা অতিরিক্ত পানি অপসারণকে পানি নিকাশ বলা হয়। পানি ব্যতীত কোনো উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না। আবার জমিতে বা গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত পানি জমা থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাটির উপরস্তর বা নিম্নস্তর উভয় স্থান থেকে পানি সরানোকে পানি নিকাশ বলে। প্রথমটিকে ভূ-পৃষ্ঠ নিকাশ (Surface drainage) এবং দ্বিতীয়টিকে অভ্যন্তরীণ (Internal drainage) নিকাশ বলা হয়।

১। বাংলাদেশে পানি নিকাশের গুরুত্ব

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় শুধু মোট পরিমাণই নয়, সমগ্র বৃষ্টিপাতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত বছরের কয়েকটি মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে জলাবদ্ধতা সমস্যা খুবই প্রকট। বাংলাদেশের মাটিকে নামান্তরে জলসম্পৃক্ত (Hydromorphic) মাটিও বলা হয়। সচরাচর সৃষ্ট জলাবদ্ধতার জন্যই এই নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে কোনো না কোনো প্রকার নিকাশ সমস্যা রয়েছে। পাহাড়ী ও উঁচু জমি ব্যতীত প্রায় সকল জমির নিকাশই অসম্পূর্ণ। পাহাড়িয়া এলাকার ঢালু ও উঁচু স্থানসহ বন্যা-বহির্ভূত জমির নিকাশ মোটামুটি উত্তম। ভাল ফলন পেতে হলে অসম্পূর্ণ নিকাশসম্পন্ন জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর এলাকার বহু হাওড় বিল এবং খুলনা, রাজশাহী ও পাবনা জেলার বেশ কিছু এলাকার (চলন বিল) জমি জলাবদ্ধতার জন্য অনাবাদী থেকে যায়। নদী ভরাট হয়ে যাওয়া এবং স্রোত ধারার পরিবর্তনসহ বন্যা ও বৃষ্টিপাতের কারণে এসব স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। প্লাবনের গভীরতা কম হলে সেখানে রোপা আমন ধান চাষ করা যায়। অন্যান্য জমিতে কোনো ফসল চাষ করা যায় না। বড় বড় হাওড়-বিল ছাড়াও বাংলাদেশের সমভূমিতেও অভ্যন্তরীণ নিকাশের সমস্যা রয়েছে, যার জন্য অনেক ফসলের ফলন কম হয়। এসব বিষয়ের ভিত্তিতে বহুদিন আগে থেকে বাংলাদেশের নানা স্থানে পানি নিকাশ প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে; যেমন—

ক. পুরাতন ডাকাতিয়া ও ক্ষুদে ফেনী নদীর নিকাশ উন্নয়ন

বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা এলাকার প্রায় ৭০০ বর্গ কিলোমিটার স্থানের নিকাশের জন্য এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে।

খ. গোমতি নদী পুনঃখনন

প্রায় ১২ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে কুমিল্লায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গ. ফরিদপুর নিকাশ প্রকল্প

প্রায় ৪০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ফরিদপুর ভূমি নিকাশের জন্য প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে। সারা দেশের মোট প্রয়োজনের তুলনায় এসব পদক্ষেপ নগণ্য। দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে এবং কৃষি উৎপাদনের জলাবদ্ধতার ঝুঁকি কমিয়ে এবং উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে আরও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জলাবদ্ধতার কারণ ও প্রভাব

বাংলাদেশে জলাবদ্ধতার প্রধান প্রধান কারণ নিম্নরূপ উল্লেখ করা যায় —

১. অতিবৃষ্টি হওয়া

অতিবৃষ্টির জন্য জমিতে জলাবদ্ধতার দরুন বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। জলাবদ্ধতা জমি প্রস্তুত কাজ বিলম্বিত করে, ফসলের পরিচর্যা ও সারের কার্যকারিতা বিঘ্নিত করে এবং এভাবে ফসলের ফলন কমিয়ে দেয়। অতিবৃষ্টির জন্য জমির উপরিভাগে বেশি জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। মাটির ভেদ্যতা কম হলে অতিবৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ নিকাশেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

২. জলাভূমির উপস্থিতি

বাংলাদেশে অনেক জমি রয়েছে যা অধিকাংশ সময় জলাবদ্ধ থাকে বলে সেখানে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। উদাহরণ হিসেবে হাওড় - বিল, ডোবা, বেসিন, অবদ্ধ সমতল ভূমি, গোপালগঞ্জ ও খুলনায় জলাভূমির নাম করা যায়। জমায়িত পানি না সরিয়ে এসব জমিতে অর্থনৈতিকভাবে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

৩. জমির নিকাশ ব্যবস্থা না থাকা

বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিতেই নিকাশের স্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত নেই। ফলে নিচু ও মঝারি নিচু এলাকার জমির নিকাশ অসম্পূর্ণ।

৪. লবণাক্ত এলাকার অগভীর পানিস্তর

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার পানি লবণাক্ত হওয়ায় এবং পানিস্তর যথেষ্ট উপরে থাকায় সেখানে পানি নিকাশের নিশ্চয়তা বিধান ব্যতীত উত্তম ফসল আশা করা যায় না। এই এলাকার সমগ্র জোয়ার-ভাটার অধীন জমিতে নিকাশের যথার্থ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

মাটিতে জলাবদ্ধতার অপকারিতা

মাটি ও ফসলে জলাবদ্ধতার প্রধান অপকারিতাসমূহ নিম্নরূপ —

১. মাটির রন্ধ্র পরিসর পানিপূর্ণ হয়ে বায়ু চলাচল হ্রাস পায়;
২. মাটির সংযুতি আলগা (loose) হয়ে যায় এবং বর্ণ পরিবর্তিত হয়;

৩. মাটির বিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে ;
৪. মাটিতে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে ;
৫. মৃত্তিকা তাপমাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধির ধারা পরিবর্তিত হয় ;
৬. সবাত অণুজীবের কার্যাবলী প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ;
৭. ঘাস ও কিছু সাইপেরাসজাতীয় আগাছার আক্রমণ বৃদ্ধি পায় ;
৮. উদ্ভিদ শিকড়ের শ্বসন ব্যাহত হয় ;
৯. জৈব পদার্থের স্বাভাবিক পচনক্রিয়া বিঘ্নিত হয় ;
১০. নাইট্রেট দ্রবণ নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে উদ্বায়িত হয় ।

১. মাটির অণুছিদ্র (Micropore) পানি আবদ্ধ হয়

মাটির সূক্ষ্ম রন্ধ্রস্থান বন্ধ হলে মাটির চলাচল হ্রাস পায় । উদ্ভিদ শিকড়ে শ্বসন না হলে শিকড় কোষের অভ্যন্তরে পানি ও পুষ্টি উপাদানের চলাচল হয় না।

২. মাটির সংযুতি শিথিল হয়ে যায়

মাটি অনেক দিন জলাবদ্ধ থাকলে মাটির সংযুতি শিথিল হয়ে যায়। জলাবদ্ধতার ফলে মাটির বর্ণ কিছুটা গাঢ় হয়। বিজারিত পরিবেশে ফেরাস আয়নের প্রাধান্য এই বর্ণ পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে।

৩. মাটির বিক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে

জলাবদ্ধ পরিবেশে মাটির অম্লমানে পার্থক্য দেখা দেয়। সাধারণত কোনো মাটি বেশ কিছু দিন জলাবদ্ধ থাকলে এর অম্লমান ৭ এর কম বা বেশি যা-ই থাকুক না কেন তা ৭ এর কাছাকাছি (প্রশম) চলে আসে। জলাবদ্ধ জমিতে বিজারিত আয়ন উৎপাদন যেমন - ফেরাস, ম্যাঙ্গানাস ও এমোনিয়াম জমা হওয়া এবং এলুমিনিয়ামের অধিকতর হারে দ্রবীভবন অম্লমানের এই পরিবর্তন ঘটায়।

৪. জলাবদ্ধ জমিতে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়

জলাবদ্ধ জমিতে উৎপাদিত বিষাক্ত দ্রব্য বা কোনো কোনো উপাদানের বিষাক্ততা মাত্রায় উপস্থিতি ফসলের ক্ষতি করে। উদাহরণ হিসেবে ইথাইলিন (Ethyline) ও ম্যাঙ্গানিজের অতিরিক্ততা এবং সালফাইড, বিউটারিক এসিড এবং ইথানল উৎপাদনের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। জলাবদ্ধ জমিতে এসব দ্রব্য পরিমাণে বেশি হলে তা ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে

৫. মৃত্তিকা তাপমাত্রায় অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে

জলাবদ্ধতা মাটির তাপমাত্রা পরিবর্তনে অস্বাভাবিকতা আনয়ন করে পানির চেয়ে মৃত্তিকা খনিজের তাপাঙ্ক (specific heat) বেশি বলে এই অসুবিধা দেখা দেয় মাটির চেয়ে পানির তাপ পরিবাহিতা বেশি। সবাত অবস্থায় উপর মৃত্তিকা উষ্ণ থাকার সম্ভাব্য সময়ে জমি জলাবদ্ধ থাকলে এবং জৈব দ্রব্যের দ্রব্যের বিয়োজন কম হলে মাটির নিজস্ব তাপ উৎপাদন হার কমে যায়। জলাবদ্ধ জমি রাতে অপেক্ষাকৃত গরম থাকে।

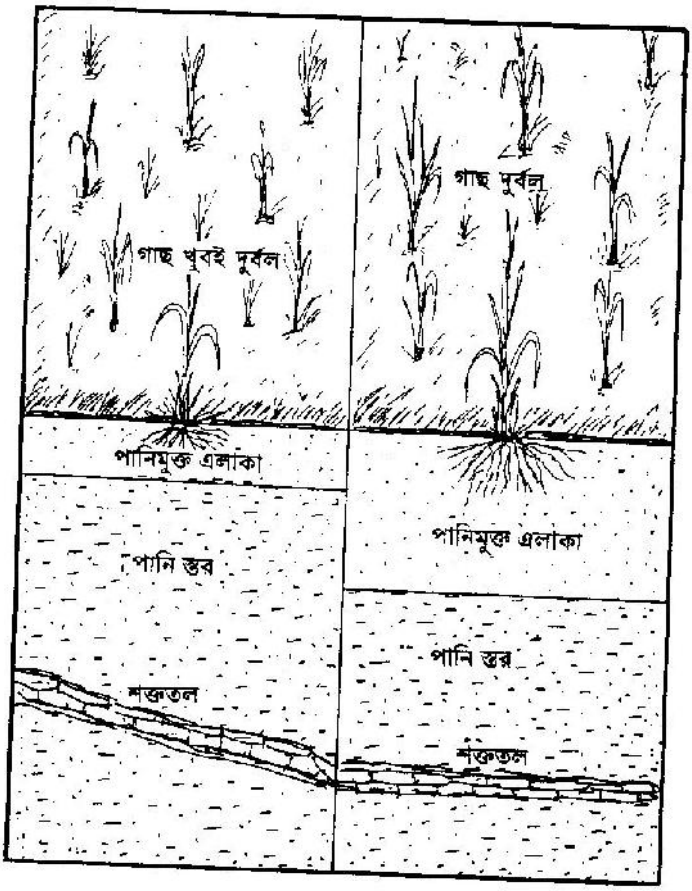

চিত্র ৬৭ : অনিষ্কাশিত জমিতে ফসলের বৃদ্ধি

৬. শিকড়ের শ্বসন ও বিস্তৃতি কম হয়

বায়ু চলাচলসম্পন্ন জমিতে জন্মানো উদ্ভিদের শিকড় বিভিন্ন সময়ে পানি পরিশোষণের জন্য মাটির গভীরে বা পার্শ্ব বিস্তৃত হয়, কিন্তু জলাবদ্ধ জমিতে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা কম। অবশ্য উদ্ভিদের শ্বসন হার (মুক্ত অক্সিজেনের ঘাটতির দরুন) কমে গেলে প্রকৃত শিকড়ের বৃদ্ধিই কমে যায়. শিকড়ের বৃদ্ধি হ্রাস পেলে সামগ্রিকভাবে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।

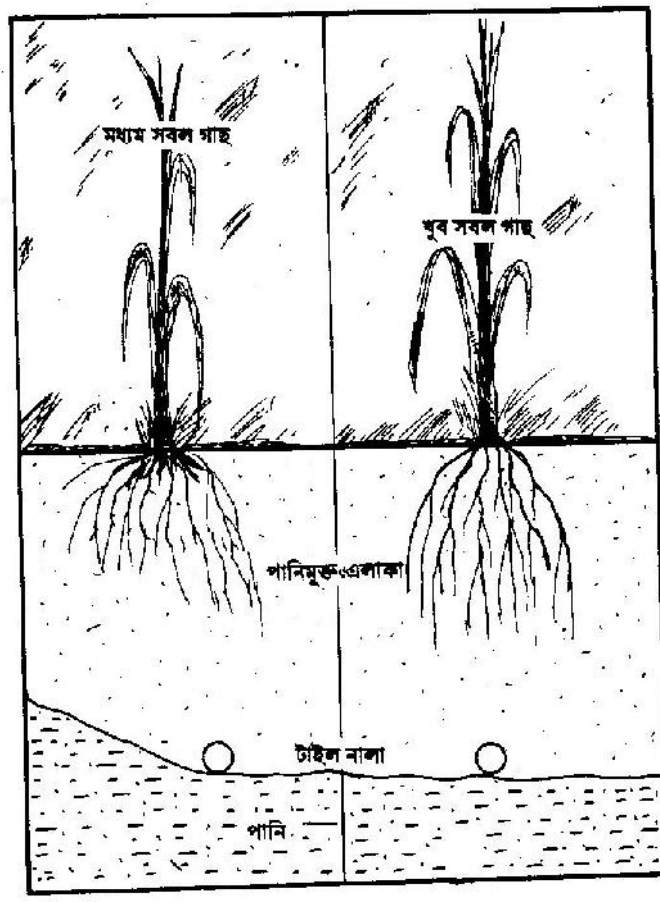

চিত্র ৬৮ : টাইল নিকাশযুক্ত জমিতে ফসলের বৃদ্ধি

৭. সবাত অণুজীবের কার্যাবলী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়

মাটির বিভিন্ন সবাত অণুজীব যেমন, নাইট্রিফিকেশন ব্যাকটেরিয়া, জৈব পদার্থ বিয়োজনকারী সবাত ব্যাকটেরিয়া এবং সকল প্রকার ছত্রাকের কার্যবলী বন্ধ হয়ে যায়। মাটিতে সরাসরি নাইট্রোজেন সংযোজনকারী *Azotobactor* বিজারণকারী ব্যাকটেরিয়ারও কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে। সালফেট ও নাইট্রেট বিজারণকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যতৎপরতা বেড়ে যায়। অতএব, জলাবদ্ধতা উপকারী সবাত অণুজীবের কার্যাবলী বন্ধ করে দিয়ে ভূমির স্বাভাবিক উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতার অবনতি ঘটায়। উল্লেখযোগ্য যে, জলাবদ্ধ জমিতে উপকারী ছত্রাকের কার্যবলী প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বললেই চলে।

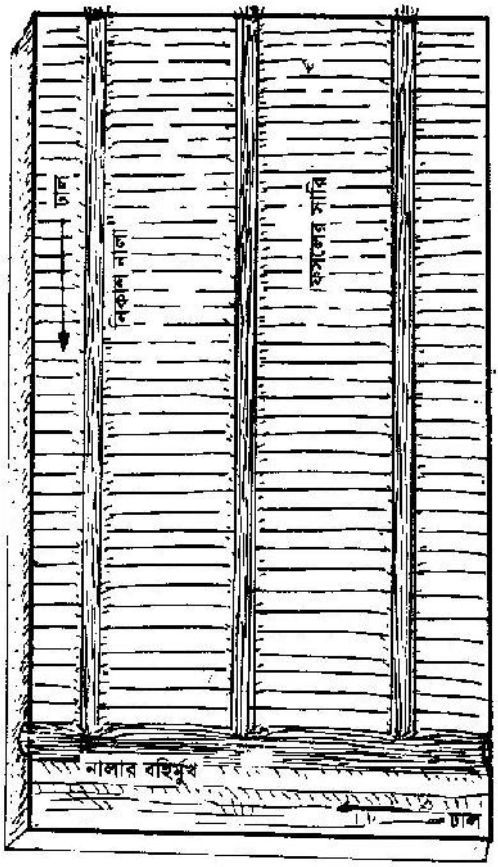

চিত্র ৬৯ : প্রাকৃতিক মুক্তনালা নিকাশ পদ্ধতি

৮. ঘাসজাতীয় আগাছা বেড়ে যায়

জলবদ্ধ জমিতে Gramineae গোত্রের কিছু আগাছা যেমন– ক্ষুদে শ্যামা, বড় শ্যামা, চেলে ঘাস ; Cyperaceae গোত্রের কিছু সংখ্যক নুথা ও চেচরা প্রজাতির আগাছার প্রকোপ বেড়ে যায়। শুধু তাই নয় জলাবদ্ধ অবস্থায় আগাছা নিড়ানো অসুবিধাজনক বলে ঋতুভিত্তিক অন্যান্য আগাছাও বিস্তৃতি লাভ করে।

৯. জৈব পদার্থের স্বাভাবিক বিযোজন বিঘ্নিত হয়

সবাত পরিবেশে শর্করা, শ্বেতসার বিযোজিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। বিযোজন ক্রিয়ার হারও বেশ দ্রুত। কিন্তু বায়ুহীন বা অবাত পরিবেশে স্বাভাবিক জারণ-বিজারণের বদলে অবাত বিযোজন শুরু হয়। ফলে বিক্রিয়ার সমাপ্তি দ্রব্য কার্বন ডাই-অক্সাইড না হয়ে মিথেন, ইথাইলিন ও নানা প্রকার জৈব এসিড উৎপন্ন হয়। এসব জৈব এসিডের পরিমাণ বেশি হলে তা উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত হতে পারে।

$$\text{সবাত } C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow O_2 + H_2O$$
$$\text{অবাত } C_6H_{12}O_6 + H(e^-) \longrightarrow H_4(H_2S)de$$

১০. নাইট্রোটের অপচয় ঘটে

উদ্ভিদ প্রধানত নাইট্রেট আয়ন হিসেবে নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে। কিন্তু জলাবদ্ধ জমিতে নাইট্রেট বিজারিত হয়ে নাইট্রেট বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং মাটি থেকে এর অপচয় হয়। ফলে জলাবদ্ধ জমিতে প্রায় সকল ফসল নাইট্রোজেন ঘাটতির সম্মুখীন হয়।

$$NO_3 + H^+ \longrightarrow N_2$$

১১. হাইড্রোজেন সালফেট ও মিথেন উৎপন্ন হয়

মাটিস্থ সালফেট ও কার্বনেট থেকে অবাত পরিবেশে অতিরিক্ত মাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড ও মিথেন উৎপাদিত হলে তা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয়।

$$SO_4 + H \longrightarrow H_2S$$
$$CO_3 + H \longrightarrow CH_4$$

পানি নিকাশের উপকারিতা

পানি নিকাশের প্রধান প্রধান উপকারিতা নিম্নরূপ—

১. জলাবদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন উর্বরসম্পন্ন মাটিতে নিকাশের ব্যবস্থা করলে একে আরও অনেক উৎপাদনশীল পর্যায়ে উন্নত করা যায়।

২. অব-উষ্ণ অঞ্চলের উপযুক্ত নিকাশসম্পন্ন মাটি বসন্তের শুরুতেই বেশ উষ্ণ থাকে। নাতিশীতোষ্ণ ও অব-আর্দ্র উষ্ণ অঞ্চলে নিষ্কাশিত মাটির চেয়ে পানি সম্পৃক্ত মাটি ধীরে ধীরে উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। কারণ কেবল মাটির চেয়ে সমপরিমাণ মাটি ও পানি সমান উষ্ণতায় ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি তাপ পরিশোষণ করে গড়ে প্রতি ৪.৭ সে. (১০° ফা.) তাপ কমে যাওয়ার জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রাসায়নিক বিক্রিয়া শতকরা ২৫ ভাগ হারে কমতে থাকে।

৩. সুনিষ্কাশিত জমির প্রায় সকল স্থানে একই ধরনের (uniform) আর্দ্রতা থাকে বলে সেখানে ভূমিকর্ষণ কাজে সুবিধা হয়। অনিষ্কাশিত জমির স্থানভেদে আর্দ্রতা কম-বেশি থাকতে পারে বলে সমভাবে ভূমিকর্ষণ কাজ সম্পাদন করা যায় না এবং স্থানভেদে উপযুক্ত কর্ষিতাবস্থা (tilth) উৎপন্ন করা যায় না।

৪. উত্তম নিকাশসম্পন্ন মাটিতে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া হ্রাসের মাধ্যমে নাইট্রোজেনের অপচয় কমানো যায়। এতে নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বাড়ে।

৫. সুনিষ্কাশিত জমিতে বহু ধরনের মূল্যবান ফসলের চাষ করা যায়। জলাবদ্ধ জমিতে চাষোপযোগী ফসলের সংখ্যা কম। গভীর পানির ফসলের (কয়েক জাতের ধান ব্যতীত) চাষ করা যায় না। স্থানভেদে আর্দ্রতার পার্থক্য বা পানির গভীরতা কম-বেশি হলে ফসলের ফলন ভাল হয় না।

৬. নিষ্কাশিত জমিতে উদ্ভিদ শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। এতে একটি উদ্ভিদ অধিক মৃত্তিকা দ্রব্য থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পরিশোষণের সুযোগ পায়। ফসল উদ্ভিদের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করলে খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. জৈব পদার্থের বিযোজন ত্বরান্বিত হয় এবং মাটির সংযুতি উন্নতি হয়। উপকারী সবাত অণুজীবের কার্যাবলী বাড়ে।

৮. মাটিতে বিষাক্ত জৈব গ্যাস উৎপন্ন হয় না।

৯. মৃত্তিকা খনিজের গাঠনিক অবস্থার উন্নতি হয়।

২। পানি নিকাশ পদ্ধতি

মৃত্তিকা নিকাশ পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার; যথা-

১. ভূ-পৃষ্ঠ পদ্ধতি বা নালা পদ্ধতি;

২. ভূ-নিম্ন পদ্ধতি।

ভূ-পৃষ্ঠ বা নালা পদ্ধতি

জমি সমতল (levelling) করা এবং গ্রেডিং করা ভূ-পৃষ্ঠ নিকাশ পদ্ধতির অন্যতম পূর্ব শর্ত। যে সকল জমিতে নিকাশ ক্ষমতা (drainage capactiy) খুবই কম বা ১০% এর কম সেখানে ভূ-পৃষ্ঠ পদ্ধতিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠ নিকাশ পদ্ধতির অপর নাম মুক্ত নালা পদ্ধতি (open ditch)। জলাবদ্ধ জমিতে সাধারণত চাক্ষুসভাবে সিক্ত জায়গা সনাক্ত করে এক সিক্ত জায়গা থেকে আরেক সিক্ত জায়গা বরাবর নালা কাটা এবং নালার বহির্মুখ দ্বারা পানি অপসারণ করা হয়। এরকম নালার ক্ষেত্রে সর্বদা খেয়াল রাখতে হয় যাতে নালাসমূহ বড় হয়ে গলিতে (gully) পরিণত না হয় এবং ভূমিক্ষয় না বাড়ায়। সূক্ষ্ম বুনটসম্পন্ন সমতল জমিতে পরিকল্পিত মুক্ত নালার দ্বারা পানি কাজ সম্পাদন করা যায়। নিকাশ ব্যবস্থা নিম্নরূপ পর্যায়ে কয়েক বছরে (সাধারণত ২ বছরে) সমাধা করা যায়।

১. জমি সমতল করা : প্রধানত বন্ধুরতা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানীয় উঁচু নিচু জায়গা সমতল করা।

২. জমি গ্রেডিং (Grading) : জমি এক বা একাধিক দিকে ক্রম ঢালু করা। নির্ধারিত স্থানসমূহে নালা তৈরি করা। নালাসমূহ অগভীর রাখতে হবে যাতে জমি কৃষি যন্ত্র চলাচলে অসুবিধা না হয়।

৩. **মুক্ত নালা তৈরি করা :** নির্ধারিত স্থানসমূহে নালা তৈরি করা। নালাসমূহ অগভীর রাখতে হবে যাতে জমি কৃষি যন্ত্র চলাচলে অসুবিধ না হয়।

ভূ-নিম্ন পানি নিকাশ পদ্ধতি

প্রধানত তিন পদ্ধতিতে ভূ-নিম্ন পানি নিকাশ সম্পন্ন করা যায়; যথা—

১. প্লাস্টিক টিউব নালা

২. টাইল নালা

৩. মোল নালা

১. **প্লাস্টিক টিউব নালা :** প্লাস্টিক টিউব নালার (Plastic tube drain) একটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে টাইল পদ্ধতির চেয়ে এর ব্যয় কম। সচ্ছিদ্র করুগেটেড পলিথিলিন টিউব প্রায় ৭৫ মিটার লম্বা হয়, ওজন প্রায় ৩০ কেজি। প্রতিটি নলের মাথায় জোড়া সংযোজনের ব্যবস্থা রয়েছে। লেসার (Laser) পরিচালিত যন্ত্র দ্বারা এই নল মাটির উপযুক্ত গভীরতায় বসানো যায়। এই যন্ত্র দ্বারা সোজাভাবে দৈনিক প্রায় দেড় কিলোমিটার টিউব বসানো যায়। তাই অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে বিরাটকায় মাঠে টিউব বসানো সম্ভব। প্লাস্টিক টিউবের ব্যাস ১০ থেকে ২০ সেমি. হতে পারে।

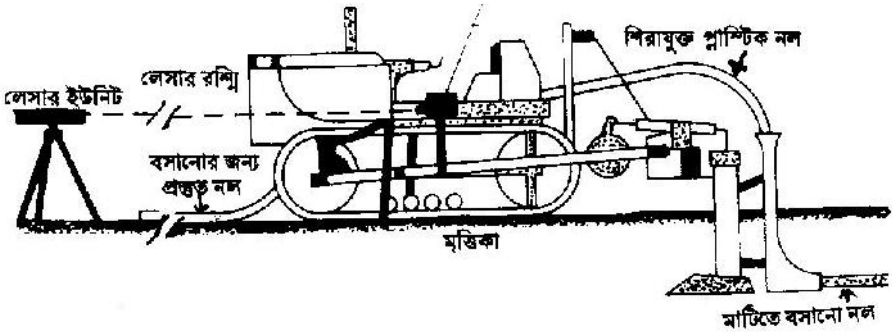

চিত্র ৭৩ : প্লাস্টিক টিউবনালা বসানোর পদ্ধতি

২. **টাইল নালা :** কোনো মাঠে উত্তমভাবে টাইল নালা (Tile drain) বসাতে হলে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। কোনো টাইল নালা পরিকল্পিত ও উত্তম-ভাবে বসাতে পারলে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক বছর ধরে ব্যবহার করা যায়।

টাইল দু' প্রকার হতে পারে, যথা—

ক. কনক্রিট নির্মিত (Concrete) টাইল

খ. পোড়া কর্দম (Burned clay) টাইল

দুই প্রকার টাইলই বেশ কার্যকর। তবে অম্লীয় মাটিতে কনক্রিট টাইল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। টাইল বসানোর গভীরতা এবং দূরত্ব মাটি ও ফসলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

মাটির ভেদ্যতা কম হলে স্বল্প গভীরে টাইল বসাতে হবে এবং টাইলে সারি থেকে সারির দূরত্বও অপেক্ষাকৃত কম হবে।

টাইল বসানোর গভীরতা ফল বাগানের জন্য ১০০ থেকে ২২৫ সেমি.; ভুট্টার জন্য ৭০ থেকে ৮০ সেমি. এবং দানা ফসলের জন্য ৬০ সেমি. দেওয়া যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব মাটির নিকাশ ক্ষমতা অনুসারে ১০ থেকে ৯০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

এঁটেল ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে টাইলের গভীরতা ১২০ সেমি. ও সারির দূরত্ব ৩০ মিটার দেওয়া যায়।

বেলে মাটিতে টাইলের গভীরতা ১৪০ সেমি. এবং সারির দূরত্ব ৯০ মিটার হলেও তেমন অসুবিধা হয় না।

টাইলের বহির্মুখে (outlet) তার জাল দেওয়া উচিত যাতে ইঁদুর, খরগোশ বা এ জাতীয় কোনো প্রাণী ঢুকতে না পারে।

টাইলের লাইনের কাছাকাছি কোনো বৃদ্ধিশীল বৃক্ষ থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে যাতে এর শিকড় টাইলে ফাটল ধরাতে না পারে।

মাটির উপর কোনো স্থান বসে গেলে বুঝতে হবে সেখানকার টাইলটি নষ্ট হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে অনতিলম্বে নতুন টাইল বসাতে হবে, নতুবা টাইল নালার ভিতরে মাটি ঢুকে গিয়ে সমস্ত লাইন অকেজো হয়ে যেতে পারে

টাইল বসানোর পদ্ধতি : টাইল বসানোর পদ্ধতি নিম্নরূপ হতে পারে ; যেমন—

ক. প্রাকৃতক (Natural) পদ্ধতি ;

খ. ইন্টারসেপশন (Interception) পদ্ধতি ;

গ. গ্রিডিরন (Gridiron) পদ্ধতি ;

ঘ. ফিশবোন (Fish bone) বা হেরিংবোন পদ্ধতি।

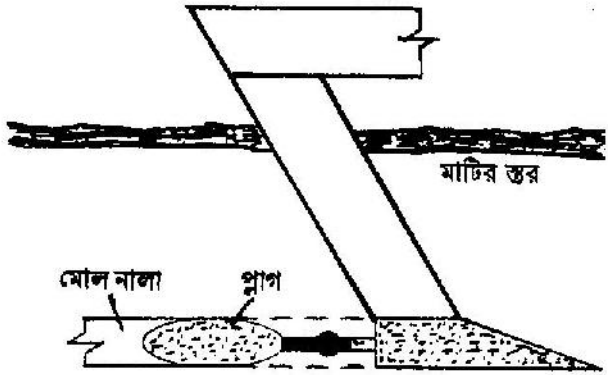

চিত্র ৭১ : মোল নালা তৈরির লাঙ্গল

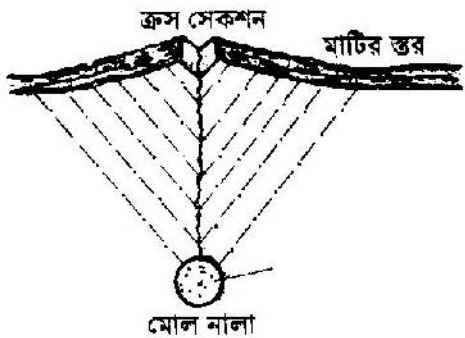

চিত্র ৭২ : জমিতে মোল নালা স্থাপন পদ্ধতি

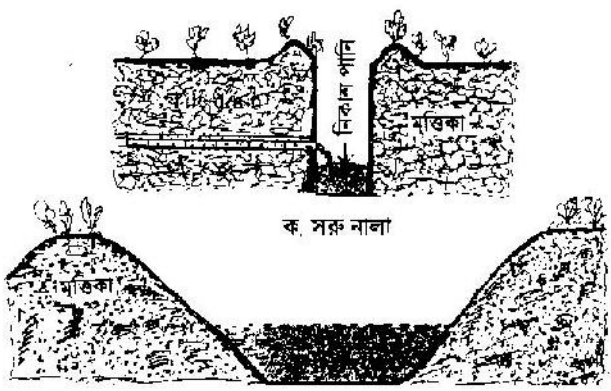

চিত্র ৭৩ : পানি নিকাশের সরু নালা ও প্রশস্ত নালা

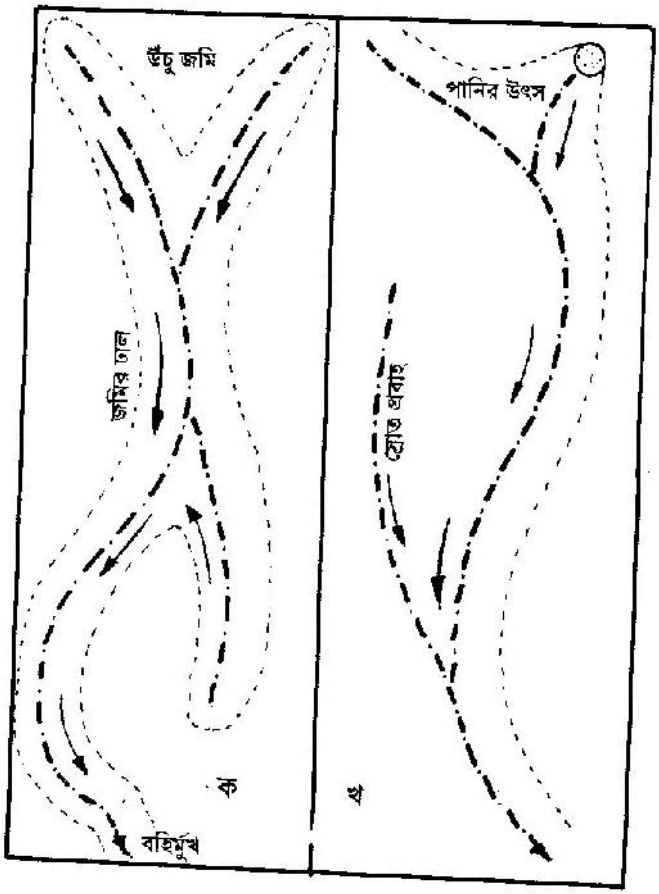

চিত্র ৭৪ : পানি নিকাশের প্রাকৃতিক ও ইন্টারসেপশন পদ্ধতি

৩. **মোল নালা পদ্ধতি :** মোল নালা অনেকটা অস্থায়ী অগভীর ধরনের নালা। টর্পেডো আকৃতি একটি বস্তু মাটি ৫০ থেকে ৬০ সেমি. গভীরতা দিয়ে চালনা করা হলে একটি নালা উৎপন্ন হয়।

অবশ্য নালা কাটার প্রথম বছরেই কিছুটা ভরাট হয়ে যেতে পারে। অস্থায়ী নিকাশ কাজের জন্য মোল নালা খুব উপযোগী।

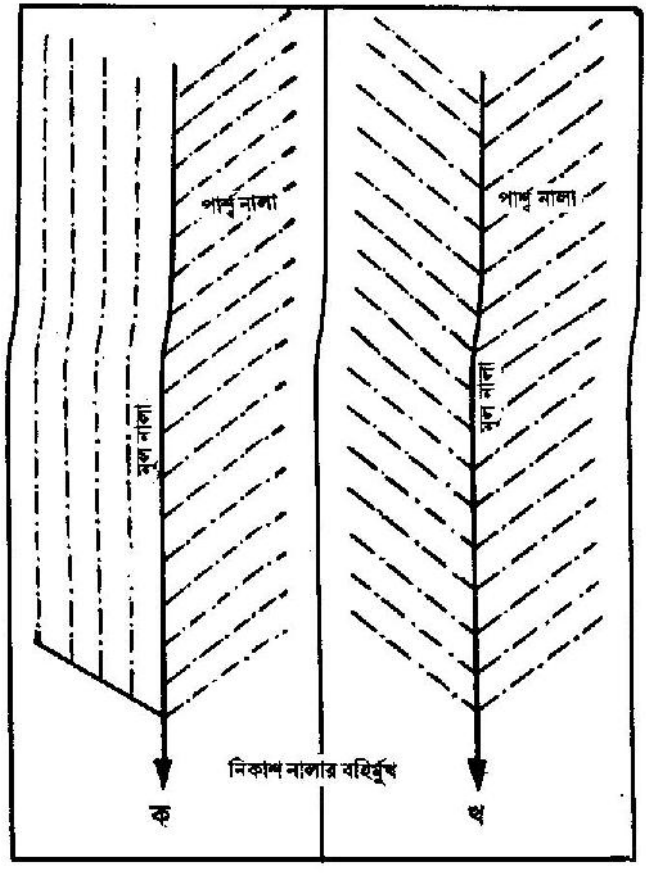

চিত্র ৭৫ : পানি নিকাশের গ্রিডিরন (ক) ও হেরিংবোন পদ্ধতি (খ)

বিভিন্ন নিকাশ পদ্ধতিতে পার্থক্য

মোল নালা	টাইল নালা	প্লাস্টিক টিউব নালা
ব্যয় কম	ব্যয় বেশি	ব্যয় মধ্যম
কম জমির জন্য সুবিধাজনক	কম জমির জন্য সুবিধাজন	বেশি জমির জন্য সুবিধাজনক
নালা ভরাট হয়	ভরাট হয় না	ভরাট হয় না

৯. জৈব পদার্থের স্বাভাবিক বিয়োজন বিঘ্নিত হয়

সবাত পরিবেশে শর্করা–শ্বেতসার বিয়োজিত হয়ে কার্বন ডাই–অক্সাইড ও তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়। বিয়োজন ক্রিয়ার হারও বেশ দ্রুত কিন্তু বায়ুহীন বা অবাত পরিবেশে স্বাভাবিক জারণ–বিজারণের বদলে অবাত বিয়োজন শুরু হয় ফলে বিক্রিয়ার সমাপ্তি দ্রব্য কার্বন ডাই–অক্সাইড না হয়ে মিথেন, ইথাইলিন ও নানা প্রকার জৈব এসিড উৎপন্ন হয়। এসব জৈব এসিডের পরিমাণ বেশি হলে তা উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত হতে পারে।

সবাত $C_6H_{12}O_6 + O_2 \longrightarrow O_2 + H_2O$

অবাত $C_6H_{12}O_6 + H(e^-) \longrightarrow H_4(H_2S)de$

১০. নাইট্রেটের অপচয় ঘটে

উদ্ভিদ প্রধানত নাইট্রেট আয়ন হিসেবে নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে। কিন্তু জলাবদ্ধ জমিতে নাইট্রেট বিজারিত হয়ে নাইট্রেট বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং মাটি থেকে এর অপচয় হয়। ফলে জলাবদ্ধ জমিতে প্রায় সকল ফসল নাইট্রোজেন ঘাটতির সম্মুখীন হয়।

$$NO_3 + H^+ \longrightarrow N_2$$

১১. হাইড্রোজেন সালফেট ও মিথেন উৎপন্ন হয়

মাটিস্থ সালফেট ও কার্বনেট থেকে অবাত পরিবেশে অতিরিক্ত মাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড ও মিথেন উৎপাদিত হলে তা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হয়।

$$SO_4 + H \longrightarrow H_2S$$
$$CO_3 + H \longrightarrow CH_4$$

পানি নিকাশের উপকারিতা

পানি নিকাশের প্রধান প্রধান উপকারিতা নিম্নরূপ :

১. জলাবদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন উর্বরসম্পন্ন মাটিতে নিকাশের ব্যবস্থা করলে একে আরও অনেক উৎপাদনশীল পর্যায়ে উন্নত করা যায়।

২. অব-উষ্ণ অঞ্চলের উপযুক্ত নিকাশসম্পন্ন মাটি বসন্তের শুরুতেই বেশ উষ্ণ থাকে। নাতিশীতোষ্ণ ও অব আর্দ্র উষ্ণ অঞ্চলে নিষ্কাশিত মাটির চেয়ে পানি সম্পৃক্ত মাটি ধীরে ধীরে উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়, কারণ কেবল মাটির চেয়ে সমপরিমাণ মাটি ও পানি সমান উষ্ণতায় ৪ থেকে ৫ গুণ বেশি তাপ পরিশোষণ করে। গড়ে প্রতি ৪.৭ সে. (১০° ফা.) তাপ কমে যাওয়ার জন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রাসায়নিক বিক্রিয়া শতকরা ২৫ ভাগ হারে কমতে থাকে।

৩. সুনিষ্কাশিত জমির প্রায় সকল স্থানে একই ধরনের (uniform) আর্দ্রতা থাকে বলে সেখানে ভূমিকর্ষণ কাজে সুবিধা হয়। অনিষ্কাশিত জমির স্থানভেদে আর্দ্রতা কম-বেশি থাকতে পারে বলে সমভাবে ভূমিকর্ষণ কাজ সম্পাদন করা যায় না এবং স্থানভেদে উপযুক্ত কর্ষিতাবস্থা (tilth) উৎপন্ন করা যায় না।

৪. উত্তম নিকাশসম্পন্ন মাটিতে ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া হ্রাসের মাধ্যমে নাইট্রোজেনের অপচয় কমানো যায়। এতে নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বাড়ে।

৫. সুনিষ্কাশিত জমিতে বহু ধরনের মূল্যবান ফসলের চাষ করা যায়। জলাবদ্ধ জমিতে চাষোপযোগী ফসলের সংখ্যা কম। গভীর পানির ফসলের (কয়েক জাতের ধান ব্যতীত) চাষ করা যায় না। স্থানভেদে আর্দ্রতার পার্থক্য বা পানির গভীরতা কম-বেশি হলে ফসলের ফলন ভাল হয় না।

৬. নিষ্কাশিত জমিতে উদ্ভিদ শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। এতে একটি উদ্ভিদ অধিক মৃত্তিকা দ্রব্য থেকে বেশি পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পরিশোষণের সুযোগ পায়। ফসল উদ্ভিদের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করলে খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. জৈব পদার্থের বিয়োজন ত্বরান্বিত হয় এবং মাটির সংযুতি উন্নতি হয়। উপকারী সবাত অণুজীবের কার্যাবলী বাড়ে।

৮. মাটিতে বিষাক্ত জৈব গ্যাস উৎপন্ন হয় না।

৯. মৃত্তিকা কণিকের গাঠনিক অবস্থার উন্নতি হয়।

২। পানি নিকাশ পদ্ধতি

মৃত্তিকা নিকাশ পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার ; যথা-

১. ভূ-পৃষ্ঠ পদ্ধতি বা নালা পদ্ধতি ;

২. ভূ-নিম্ন পদ্ধতি।

ভূ-পৃষ্ঠ বা নালা পদ্ধতি

জমি সমতল (levelling) করা এবং গ্রেডিং করা ভূ পৃষ্ঠ নিকাশ পদ্ধতির অন্যতম পূর্ব শর্ত। যে সকল জমিতে নিকাশ ক্ষমতা (drainage capacty) খুবই কম বা ১০% এর কম সেখানে ভূ পৃষ্ঠ পদ্ধতিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ভূ-পৃষ্ঠ নিকাশ পদ্ধতির অপর নাম মুক্ত নালা পদ্ধতি (open ditch)। জলাবদ্ধ জমিতে সাধারণত চাক্ষুসভাবে সিক্ত জায়গা সনাক্ত করে এক সিক্ত জায়গা থেকে আরেক সিক্ত জায়গা বরাবর নালা কাটা এবং নালার বহির্মুখ দ্বারা পানি অপসারণ করা হয়। এরকম নালার ক্ষেত্রে সর্বদা খেয়াল রাখতে হয় যাতে নালাসমূহ বড় হয়ে গালিতে (gully) পরিণত না হয় এবং ভূমিক্ষয় না বাড়ায়। সুক্ষ্ম বুনটসম্পন্ন সমতল জমিতে পরিকল্পিত মুক্ত নালার দ্বারা পানি কাজ সম্পাদন করা যায়। নিকাশ ব্যবস্থা নিম্নরূপ পর্যায়ে কয়েক বছরে (সাধারণত ২ বছরে) সমাধা করা যায়

১. জমি সমতল করা : প্রধানত বন্ধুরতা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে স্থানীয় উঁচু নিচু জায়গা সমতল করা।

২. জমি গ্রেডিং (Grading) : জমি এক বা একাধিক দিকে ঢাল তৈরি করা। নির্ধারিত স্থানসমূহে নালা তৈরি করা। নালাসমূহ অগভীর রাখতে হবে যাতে জমি কৃষি যন্ত্র চলাচলে অসুবিধা না হয়।

৩. মুক্ত নালা তৈরি করা : নির্ধারিত স্থানসমূহে নালা তৈরি করা। নালাসমূহ অগভীর রাখতে হবে যাতে জমি কৃষি যন্ত্র চলাচলে অসুবিধা না হয়।

ভূ-নিম্ন পানি নিকাশ পদ্ধতি

প্রধানত তিন পদ্ধতিতে ভূ-নিম্ন পানি নিকাশ সম্পন্ন করা যায়; যথা—

১. প্লাস্টিক টিউব নালা

২. টাইল নালা

৩. মোল নালা

১. প্লাস্টিক টিউব নালা : প্লাস্টিক টিউব নালার (Plastic tube drain)একটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে টাইল পদ্ধতির চেয়ে এর ব্যয় কম। সছিদ্র করুগেটেড পলিথিলিন টিউব প্রায় ৭৫ মিটার লম্বা হয়, ওজন প্রায় ৩০ কেজি। প্রতিটি নলের মাথায় জোড়া সংযোজনের ব্যবস্থা রয়েছে। লেসার (Laser) পরিচালিত যন্ত্র দ্বারা এই নল মাটির উপযুক্ত গভীরতায় বসানো যায়। এই যন্ত্র দ্বারা সোজাভাবে দৈনিক প্রায় দেড় কিলোমিটার টিউব বসানো যায়। তাই অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে বিরাটকায় মঠে টিউব বসানো সম্ভব। প্লাস্টিক টিউবের ব্যাস ১০ থেকে ২০ সেমি. হতে পারে।

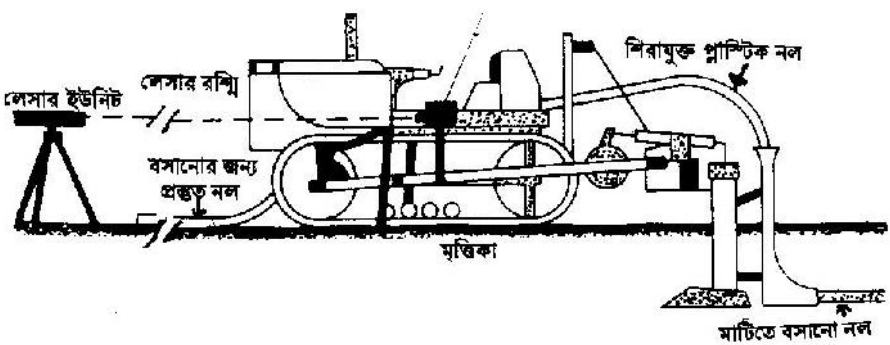

চিত্র ৭০ : প্লাস্টিক টিউবনালা বসানোর পদ্ধতি

২. টাইল নালা : কোনো মাঠে উত্তমভাবে টাইল নালা (Tile drain) বসাতে হলে সর্ব প্রথম এ বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। কোনো টাইল নালা পরিকল্পিত ও উত্তম-ভাবে বসাতে পারলে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক বছর ধরে ব্যবহার করা যায়।

টাইল দু' প্রকার হতে পারে, যথা—

ক. কনক্রিট নির্মিত (Concrete) টাইল

খ. পোড়া কর্দম (Burned clay) টাইল

দুই প্রকার টাইলই বেশ কার্যকর। তবে অম্লীয় মাটিতে কনক্রিট টাইল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। টাইল বসানোর গভীরতা এবং দূরত্ব মাটি ও ফসলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

মাটির ভেদ্যতা কম হলে স্বল্প গভীরে টাইল বসাতে হবে এবং টাইলে সারি থেকে সারির দূরত্বও অপেক্ষাকৃত কম হবে।

টাইল বসানোর গভীরতা ফল বাগানের জন্য ১০০ থেকে ২২৫ সেমি.; ভুট্টার জন্য ৭০ থেকে ৮০ সেমি. এবং দানা ফসলের জন্য ৬০ সেমি. দেওয়া যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব মাটির নিকাশ ক্ষমতা অনুসারে ১০ থেকে ৯০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

এঁটেল ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে টাইলের গভীরতা ১২০ সেমি. ও সারির দূরত্ব ৩০ মিটার দেওয়া যায়।

বেলে মাটিতে টাইলের গভীরতা ১৪০ সেমি. এবং সারির দূরত্ব ৯০ মিটার হলেও তেমন অসুবিধা হয় না।

টাইলের বহির্মুখে (outlet) তার জাল দেওয়া উচিত যাতে ইঁদুর, খরগোশ বা এ জাতীয় কোনো প্রাণী ঢুকতে না পারে।

টাইলের লাইনের কাছাকাছি কোনো বৃদ্ধিশীল বৃক্ষ থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে যাতে এর শিকড় টাইলে ফাটল ধরতে না পারে।

মাটির উপর কোনো স্থান বসে গেলে বুঝতে হবে সেখানকার টাইলটি নষ্ট হয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে অনতিলম্বে নতুন টাইল বসাতে হবে, নতুবা টাইল নালার ভিতরে মাটি ঢুকে গিয়ে সমস্ত লাইন অকেজো হয়ে যেতে পারে।

টাইল বসানোর পদ্ধতি : টাইল বসানোর পদ্ধতি নিম্নরূপ হতে পারে ; যেমন—

ক. প্রাকৃতিক (Natural) পদ্ধতি ;

খ. ইন্টারসেপশন (Interception) পদ্ধতি ;

গ. গ্রিডিরন (Gridiron) পদ্ধতি ;

ঘ. ফিশবোন (Fish bone) বা হেরিংবোন পদ্ধতি।

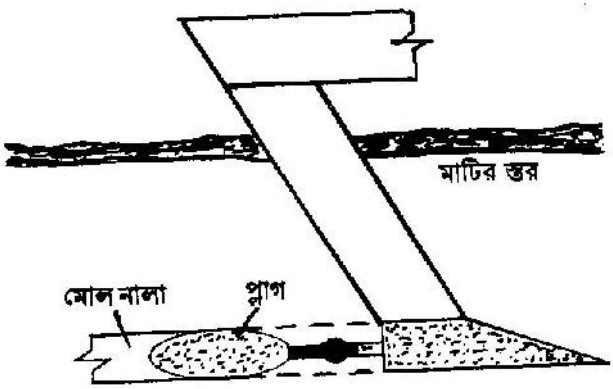

চিত্র ৭১ : মোল নালা তৈরির লাঙ্গল

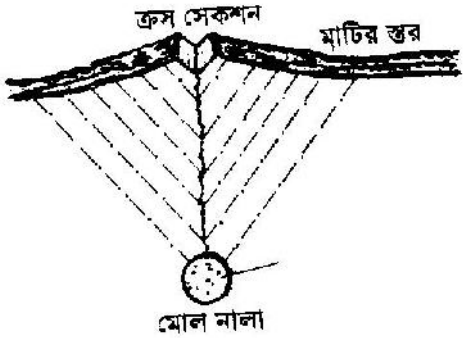

চিত্র ৭২ : জমিতে মোল নালা স্থাপন পদ্ধতি

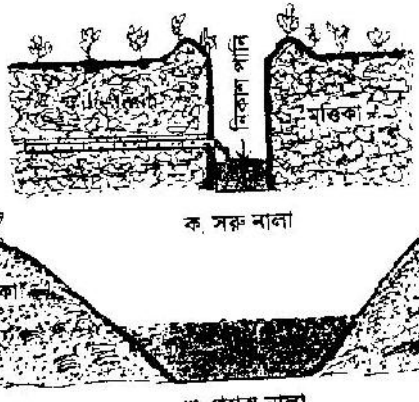

চিত্র ৭৩ : পানি নিকাশের সরু নালা ও প্রশস্ত নালা

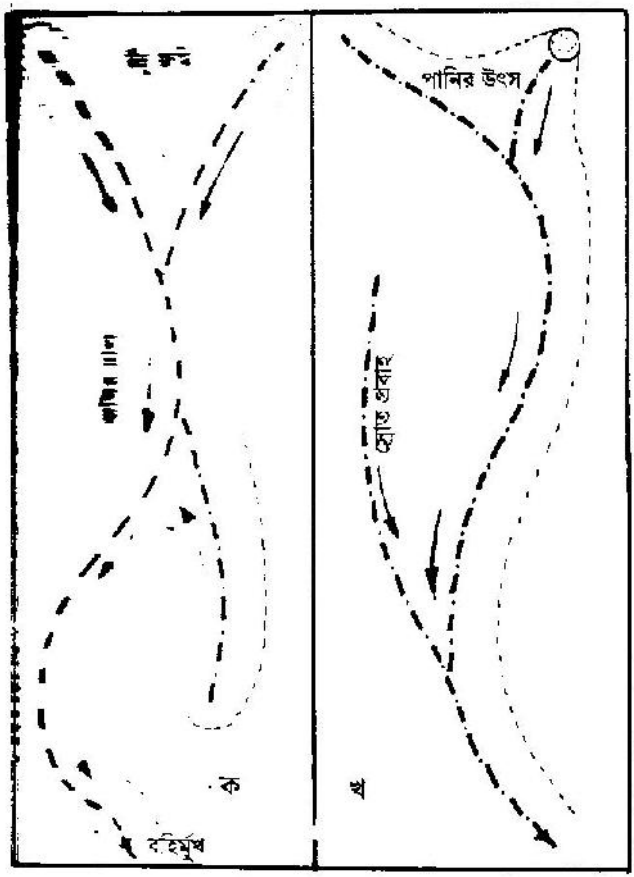

চিত্র [illegible] : পানি নিকাশের প্রাকৃতিক ও ইন্টারসেপশন পদ্ধতি

৫. মোল নালা পদ্ধতি : মোল নালা অনেকটা অস্থায়ী অগভীর ধরনের নালা। টর্পেডো [illegible] একটি [illegible] মাটি ৫০ থেকে ৬০ সেমি. গভীরতা দিয়ে চালনা করা হলে একটি নালা উৎপন্ন হয়।

এরূপ নালা কাটার প্রথম বছরেই কিছুটা ভরাট হয়ে যেতে পারে। অস্থায়ী নিকাশ কাজের জন্য মোল নালা খুব উপযোগী।

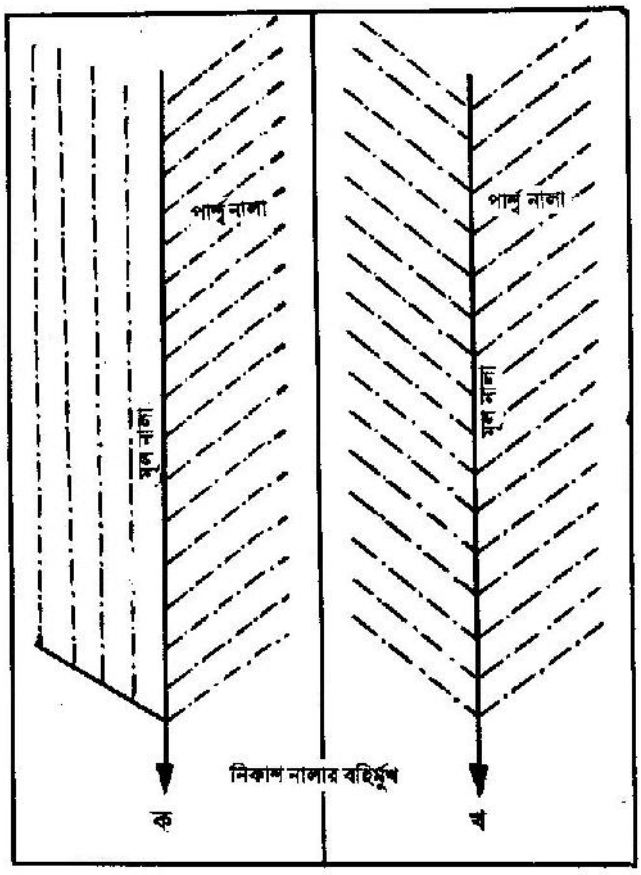

চিত্র ৭৫ : পানি নিকাশের গ্রিডিরন (ক) ও হেরিংবোন পদ্ধতি (খ)

বিভিন্ন নিকাশ পদ্ধতিতে পার্থক্য

মোল নালা	টাইল নালা	প্লাস্টিক টিউব নালা
ব্যয় কম	ব্যয় বেশি	ব্যয় মধ্যম
কম জমির জন্য সুবিধাজনক	কম জমির জন্য সুবিধাজনক	বেশি জমির জন্য সুবিধাজনক
নালা ভরাট হয়	ভরাট হয় না	ভরাট হয় না

নিকাশ পদ্ধতি মনোনয়ন

জমি থেকে পানি অপসারণের জন্য যথোপযুক্ত নিকাশ পদ্ধতি মনোনয়ন করা আবশ্যক। সকল ধরনের জমি একই পদ্ধতির দ্বারা নিকাশ করা সম্ভব নয়। জমির ও মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য এবং মৃত্তিকা পানির অবস্থান পরিস্থিতি অনুসারে নিকাশের পদ্ধতি মনোনীত করতে হয়.

ভূ-পৃষ্ঠ পদ্ধতিতে পানি নিকাশের একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে যে, জমির উপরিভাগ সমতল করতে হবে, সাথে সাথে পানি গড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ঢালুও থাকতে হবে।

ভূ-নিম্ন নিকাশের জন্য জমি ভেদ্য হবে যাতে পানির দ্রুত অনুস্রবণ ঘটে এবং যাতে এই পানি পাইপের মাধ্যমে দূরে সরানো যায়।

এঁটেল মাটির ভেদ্যতা কম বলে ভূ-নিম্নস্থ নিকাশ পদ্ধতি তেমন কার্যকর করা যায় না। এসব মাটিতে ভূ-পৃষ্ঠ মুক্ত নালা পদ্ধতিই (open ditch) অপেক্ষাকৃত কার্যকর।

ভূ-নিম্ন পদ্ধতিতে পানি নিকাশের জন্য মাটির নিচে পাইপ বসিয়ে একটি স্থায়ী অব-কাঠামো সৃষ্টি করা ব্যয়সাধ্য। তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে মাটির গুণাবলী, জলাবদ্ধতার মাত্রা ও ভূমির উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—

১. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও বিতরণ (তীব্রতা বা ঘনত্ব);
২. মাটির ভেদ্যতা, বুনট ও পার্শ্বচিত্রের বৈশিষ্ট্য যথা- দৃঢ়স্তরের (hardpan) উপস্থিতি ও মাটির গভীরতা।
৩. ভূমির বন্ধুরতা উপাদান (ঢাল ও পানি বের হওয়ার স্থান বা বহির্মুখ);
৪. প্রচলিত ও সম্ভাব্য সেচ পদ্ধতি।

জমিতে ভূ-নিম্নস্থ পদ্ধতি অবলম্বন করলে জমির দ্রুত নিকাশ ঘটবে সেটি সর্বদা আশা করা যায় না। মাটির মাঠ দক্ষতা আর্দ্রতায় যে রন্ধ্রস্থান পানিতে পূর্ণ থাকে, তা ভূ-গর্ভস্থ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে অনুস্রাবিত হয়ে নিকাশ নলে ঢুকবে না। মাটির মোট রন্ধ্র পরিসর থেকে যে পরিসরে মাধ্যাকর্ষীয় শক্তির পানি চলাচল করে মাঠ ক্ষমতা আর্দ্রতায় পানিপূর্ণ পরিসর বাদ দিলে যে আয়তন রন্ধ্র পরিসর অবশিষ্ট থাকে তাকে মাটির নিকাশ ক্ষমতা বলে।

উদাহরণ

কোনো মাটির রন্ধ্র পরিসর ৬০% এবং মাঠ ক্ষমতায় পানিপূর্ণ রন্ধ্র পরিসর ২৫%। এর নিকাশ ক্ষমতা কত?

নিকাশ ক্ষমতা = ৬৫–২৫ = ৪০%. মাটির নিকাশ ক্ষমতা ১০% এর বেশি হলে সেক্ষেত্রে ভূ-নিম্ন নালা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

মৃত্তিকার প্রকৃতি ও নিকাশ পদ্ধতি মনোনয়নের বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো

জমি	নিকাশ পদ্ধতি
১. ঢালু জমি	চুয়ানী স্থান এবং নিম্ন এলাকায় ইন্টারসেপ্টার লাইন বসাতে হবে।
২. আবদ্ধ বেসিন সমতল এলাকা (জলভূমি)	নিকাশ বহির্মুখের অসুবিধা, পাম্প দ্বারা পানি সরানোর প্রয়োজন হতে পারে।
৩. গভীরভাবে ভেদ্য বেলে মাটি	অধিকাংশ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।
৪. গভীর স্বল্প ভেদ্য এঁটেল মাটি	উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনা, মোল নালা ও ভূ-পৃষ্ঠ ড্রিচ নালা ব্যবহার করা যায়।
৫. স্বল্প ভেদ্য স্তরের উপর অগভীর ভেদ্য স্তর	অভেদ্য স্তরের উপরে টিউব বা টাইল নালা সঠিক সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন।
৬. মোটা বা বালি ক্ষুদ্রাকার নুড়ির উপর গভীর (২.৭ থেকে ৩.৭ মিটার) মৃত্তিকা	অগভীর পদ্ধতি, আর্দ্র এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠ নালা অবলম্বন।
৭. সেচের সাথে পানি তলের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে	গ্রিডের উপর টিউব নল এবং তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ।
৮. বৃষ্টির সাথে পানি তলের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে	ভূ-পৃষ্ঠ নিকাশ, টিউব বা টাইল নালা বিবেচনা করা যেতে পারে।
৯. মাঠে অগভীর পুকুর অনুরূপ আবদ্ধ পানি থাকে।	ভূ-পৃষ্ঠ গ্রেডিং করা এবং ভূ-পৃষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বন।

নবম অধ্যায়
ভূমিকর্ষণ

বপন করা বীজের অঙ্কুরোদ্গম এবং রোপণ করা চারার বৃদ্ধি উন্নয়ন সাধনকল্পে মাটিতে অনুকূল ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য যন্ত্রপাতি দ্বারা মৃত্তিকা আলোড়নের প্রক্রিয়াসমূহকে ভূমিকর্ষণ বলে

ভূমিকর্ষণের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

ভূমিকর্ষণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ও উপকারিতা উল্লেখ করা হলো–

১. উত্তম বীজতলা তৈরি করা ;
২. দৃঢ় চাপ–বাঁধা মাটি আলগা করা ;
৩. মৃত্তিকা ঢেলা গুড়ো করা, যাতে বীজ বা চারার শিকড় ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে ;
৪. আলগা মাটিকে পুনরায় একটি নির্দিষ্ট দৃঢ়তা দান করা যাতে বায়ু ও আর্দ্রতার মধ্যে একটি সুষম অনুপাত বিদ্যমান থাকে ;
৫. মাটি ও আগাছা আলোড়িত করে আগাছা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ;
৬. পঁচনযোগ্য আগাছা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ;
৭. জৈব দ্রব্য ও সার মাটির সাথে মিশ্রিত করা ;
৮. মাটির তাপ ও তাপ বিনিময়ের মধ্যে সমতা বিধান করা ;
৯. মাটিতে পানি পরিশোষক বৃদ্ধি করা ;
১০. মাটিতে পানির অনুস্রবণজনিত অপচয় হ্রাস করা ;
১১. পোকামাকড় ও রোগজীবাণু বিনষ্ট করা ;
১২. মাটিতে সৃষ্ট ক্ষতিকর বায়বীয় পদার্থ সরানো ;
১৩. মাটির কৈশিকনালী ভেঙে দিয়ে পানির বাষ্পায়ন হ্রাস করা ;
১৪. উদ্ভিদের অতিরিক্ত শিকড় ছাঁটাই ও মাটির আলোড়িত করা ;
১৫. পানিসেচের উপযোগী করে বা সার প্রয়োগের উপযোগী করে (নালা ও ভেলি তৈরি) জমির উপরিভাগ তৈরি করা ;
১৬. ভূমিক্ষয় রোধের উপযোগী করে জমির উপরিভাগ তৈরি করা ;

উপরের উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এর উদ্দেশ্যসমূহ বীজ বপন, সার প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থাপনা ও আগাছা দমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ফসল উৎপাদনে কর্ষণের উপকারিতা অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে স্বীকৃত হয়েছে এবং ইতঃমধ্যে ভূমিকর্ষণ নীতি–পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বাংলাদেশে

যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি বিষয়ক সীমাবদ্ধতার কারণে ভূমিকর্ষণে লক্ষণীয় উন্নয়ন হয়নি। ভূমিকর্ষণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন বা ব্যয় ন্যায্যকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

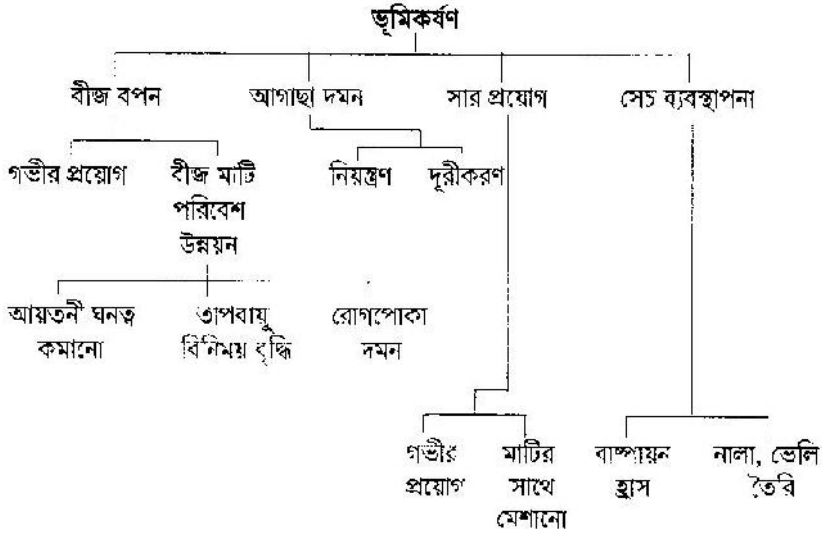

ভূমিকর্ষণ ও মৃত্তিকা ধর্ম

ভূমিকর্ষণ নিয়ন্ত্রিত মৃত্তিকা ধর্ম ও সার সেচ সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিম্নরূপ :

১. মৃত্তিকা তাপ ও আর্দ্রতা

(ক) সিক্ত ও দৃঢ় মাটি অধিকতর ঠাণ্ডা।

(খ) বাতাসিত ও সুনিষ্কাষিত মাটি তুলনামূলকভাবে উষ্ণ।

(গ) পরিমিত তাপ বীজ অঙ্কুরোদ্গমের সহায়ক

সারণি ২১ : মৃত্তিকা তাপ ও বীজের অঙ্কুরোদ্গম সময়

ফসল	তাপ ডিগ্রি সে : ভিত্তিক অঙ্কুরোদ্গম সময় (দিন)				
	৫°	১৫°	২০°	২৫°	৩০°
শিমজাতীয়	—	১৬	১১	৮	৩৩
বীট	৪২	১০	৬	৫	৪
গাজর	৫১	১০	৭	৬	৬
ভূট্টা	—	১২	৭	৪	৪

উৎস : কার্নেল সম্প্রসারণ বুলেটিন ১৯৭৬, USDA.

ভূমিকর্ষণে মৃত্তিকার উপকারিতা

১. **মৃত্তিকা তাপ ও বায়ু :** পরিমিত তাপ ও বায়ু বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সহায়ক

২. **মৃত্তিকা আর্দ্রতা :**
   (ক) পানির অনুপ্রবেশ বাড়ে।
   (খ) পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

৩. **আয়তনী ঘনত্ব :** অকর্ষিত জমির আয়তনী ঘনত্ব প্রায় ২০। কর্ষিত জমির আয়তনী ঘনত্ব ১.৪ থেকে ১.৫ যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির অধিক অনুকূল।

৪. **দানাবদ্ধতা** (Granularity) : কর্ষিত জমির দানাবদ্ধতা অকর্ষিত জমির চেয়ে উন্নত।

৫. **রন্ধ্রতা :** কর্ষিত মাটির রন্ধ্রতা বেশি।

৬. **বায়ু চলাচল :** কর্ষিত জমিতে বায়ু বিনিময় বেশি।

ভূমিকর্ষণ ও বীজতলা তৈরি

পরিমিত দৃঢ়তা ও আর্দ্রতাসম্পন্ন মাটিতে অনুকূল তাপ ও বায়ু চলাচলের ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। বীজের অঙ্কুর অতি সহজে মাটির স্তর ভেদ করে উপরে আসতে পারে। বীজতলায় জৈব সার এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও মিশ্রণের জন্য মাটির ঢেলা ভেঙে ছোট ছোট করা দরকার। সাধারণত বীজের আকারের মাটি দলার পরিমাণ মোট ১৫ সেমি. মাটির ৫০% হওয়া সর্বোত্তম। বীজ বপনের গভীরতা এমন হওয়া দরকার যাতে বীজের ব্যাসার্ধের ১০ গুণ পুরু স্তর বীজের উপরে থাকে। বীজ বপনের পর বৃষ্টি হলে বা সেচের কারণে দৃঢ় উপরাবরণ উৎপন্ন হলে তা ভেঙে ঝুরঝুরে করা দরকার। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর এবং পরবর্তীকালে সার প্রয়োগের সময় মাটি আলোড়িত করা উপকারী।

ভূমিকর্ষণ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ

বর্তমানকালে প্রচুর আগাছানাশক দ্রব্য উদ্ভবনের পরও আগাছার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভূমিকর্ষণের উপর নির্ভর করতে হয়। এই আগাছা দমন কয়েক পর্যায়ে সমাধা করা হয়। প্রথমত, বীজ বপনের পূর্বে একাধিকবার চাষ ও মই দিয়ে আগাছা উৎপাটন করা ; মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া বা জমা করে জমির বাইরে ফেলে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বীজ বপন ও বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পর সতর্কভাবে কোদলানো, ও আঁচড়া (বিদা) দেওয়া ; তৃতীয়ত, গাছ বড় হয়ে যাওয়ার সাথে নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করতে থাকা। প্রথমবারের থেকে যাওয়া আগাছা দ্বিতীয়বারে দমন করতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ের পরে জন্মানো ঋতুভিত্তিক আগাছা দমন করার পদক্ষেপ নিতে হয়। অবশ্য সব পর্যায়ের আগাছা দমনের সাথে সার প্রয়োগ বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত করে সম্পাদন করলে ভাল হয়। সকল সময় আগাছা দমন করার পর সার প্রয়োগ করা ভাল। আগাছা দমনের তেমন সুযোগ না থাকলে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সতর্ক হওয়া দরকার। আগাছানাশক ওষুধের সাথে অনেক সময় তরল সারও অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। এতে সময় ও প্রয়োগজনিত ব্যয় কম হয়।

ভূমিকর্ষণ ও সার প্রয়োগ

১. কর্ষিত জমিতে ফসলের বৃদ্ধি ও ফসল বেশি হয় বলে অধিক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়।
২. মূল সার ও জৈব সার মাটির সাথে মিশানোর জন্য ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।
৩. সারের গভীর প্রয়োগ এবং পার্শ্ব প্রয়োগের জন্য ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক।
৪. ফসল নাড়া জমিতে মিশানোর জন্য ভূমিকর্ষণ প্রয়োজন।
৫. সবুজ সার মিশ্রিত করার জন্য একাধিক বার চাষ দিতে হয়।
৬. যৌথ কর্ষণ ও সার প্রয়োগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক।
৭. সারের খণ্ড প্রয়োগের সময় ভূমি আলোড়নের প্রয়োজন হয়।
৮. অণুজৈবিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এবং জৈব পদার্থ বিয়োজনের জন্য মাটিতে ভূমিকর্ষণের মাধ্যমে আর্দ্রতা, আয়তনী ঘনত্ব, দানাবদ্ধতা, রন্ধ্রতা ও বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ভূমি কর্ষিতাবস্থা ও আর্দ্রতা

ভূমিকর্ষণ মাটির বিভিন্ন গভীরতা স্তরে শিকড়ের বৃদ্ধি, বিস্তার সহজতর করে এবং বায়ু চলাচল ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে ফসলের ফলন বাড়ায়। পরোক্ষভাবে ভূমির কর্ষিতাবস্থা (Tilth) উন্নয়নের মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে।

১. উপযুক্ত ভূমিকর্ষণ দানাবন্ধন ও সংযুতি উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ষিতাবস্থা উন্নত করে।
২. পানি বাষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকর্ষণের উপকারিতা আছে।
৩. আয়তনী ঘনত্ব কমে গিয়ে রন্ধ্রতা বাড়ায় (বাতায়ন বাড়ে)।
৪. পানির অনুস্রবণ কমানোর জন্য (ধান) কাদা কর্ষণ কার্যকর।

ভূমিকর্ষণ ও কীট-পতঙ্গ দমন

১. অবশিষ্ট নাড়া মাটির সাথে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দিলে অনেক কীটপতঙ্গ নষ্ট হয়, যেমন—গমের হেসিয়ান মাছি, গমের গিট কীড়া (joint worm) ভুট্টা মাজরা পোকা, ঘাস ফড়িং, তুলার বল পোকা, পাটল বল পোকা (pink worm) কাটুই পোকা। এসব পোকার ডিম, কীড়া সক্রিয় বা সুপ্তাবস্থায় ভূমিকর্ষণে বিনষ্ট হয়।
২. জমি চাষ দেওয়ার সময় রৌদ্রতাপে অনেক পোকা ও রোগজীবাণু নষ্ট হয়।
৩. জমি চাষ দেওয়ার পাখি অনেক কীটপতঙ্গ খেয়ে নষ্ট করে।
৪. কর্ষণের প্রভাবে মাটি শুকিয়ে গেলে *Pythium* এবং *Rhizoctonia* গণের উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণুও বিনষ্ট হয়ে থাকে।
৫. ধান জমির জলাবদ্ধ কাদায় আটকা পড়ে অনেক পোকা—মাকড় মরে যায়।

২। ভূমিকর্ষণের পদ্ধতি ও প্রকার

প্রাচীন ও আধুনিক সকল ভূমিকর্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

১. প্রচলিত (Conventional) কর্ষণ।
২. রক্ষণশীল (Conservation) কর্ষণ।

উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে প্রচলিত কর্ষণ কাজকে নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করা যায়--

১. লাঙ্গল চাষ
২. চকতি চাষ
৩. হেরো চাষ
৪. মই দেওয়া
৫. ড্রেগ চাষ(Dragging)
৬. চিজেল চাষ (Chieselling)
৭. বিন্যাস কর্ষণ (Lystering)
৮. কোদলানো।

লাঙ্গল

লাঙ্গল চাষ ভূমিকর্ষণের একটি প্রাথমিক কাজ। জমির দৃঢ় ও শক্ত মাটি লাঙ্গলের সাহায্যে আলগা ও আলোড়ন করাকে লাঙ্গল চাষ (Ploughing) বলে। এর উদ্দেশ্য—

১. জমির মাটির আলগা ও আলোড়িত করা ;
২. আগাছা উৎপাটনের মাধ্যমে বিনষ্ট করা ;
৩. পানির অনুস্রবণ বাড়ানো ;
৪. সারের গভীর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা ;
৫. জৈব সার মিশিয়ে দেওয়া ;
৬. রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা ;
৭. বায়ু চলাচল বাড়ানো ;
৮. আয়তনী ঘনত্ব কমানো ;
৯. সেচ নালা তৈরি ;
১০. সবুজ সার ফসল মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া।

লাঙ্গলের প্রকার : চালিকা শক্তি অনুসারে লাঙ্গল প্রধানত দু' প্রকার। যথা-- পশুশক্তি চালিত এবং যন্ত্রশক্তি চালিত। পশুশক্তি চালিত লাঙ্গল আমাদের দেশে দু প্রকার। যথা - দেশী লাঙ্গল ও মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল।

দেশী লাঙ্গলের সুবিধা

১. ওজনে হালকা বলে স্থানান্তর সহজ ;
২. দেশীয় পশু টানতে পারে ;
৩. দেহ সরু বলে কাঁদা কর্ষণে সুবিধাজনক ;
৪. লাঙ্গল তৈরির জন্য ব্যয় কম ;
৫. গঠন সরল বলে তৈরিতে তেমন প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না ;
৬. মেরামতও সহজ ;
৭. চালনা সহজ ;
৮. চলাচলের জন্য উন্নত রাস্তার প্রয়োজন নেই ;
৯. গ্রামীণ পরিবেশে তৈরি করা যায় এবং সর্বত্র কিনতে পাওয়া যায় ;
১০. ক্ষুদ্রাকৃতির জমিতে চালনা করা যায় ;
১১. সরু ফল দ্বারা শক্ত ও আগাছা পূর্ণ জমিতে চাষ দেওয়া যায়।

দেশী লাঙ্গলের অসুবিধা

১. চাষের গভীরতা কম ;
২. জমি চাষে অধিক শ্রম ব্যয় হয় ;
৩. অধিক কায়িক শ্রম ব্যয় হয় ;
৪. জমি চাষের জন্য বারবার চাষ দিতে হয় ;
৫. গভীরমূলী আগাছা দমনের তেমন কার্যকর হয় না ;
৬. লাঙ্গল তল (plough pan) উৎপন্ন হয় ;
৭. লাঙ্গল সহজেই ভেঙে যেতে পারে ;
৮. ফাল দ্বারা গরুর পা কেটে যেতে পারে ;
৯. তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় ;
১০. ফালের নিচে মাটি ঢুকে গিয়ে লাঙ্গলের কার্যকারিতা কমে যায়।

মোল্ড বোর্ড লাঙ্গলের সুবিধা

দেশী লাঙ্গলের মোটামুটি সবগুলো অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্য মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন—

১. চাষের গভীরতা বেশি ;
২. জমি চাষে শ্রম ঘন্টা ব্যয় কম ;
৩. মাটি আলোড়ন সুষ্ঠুভাবে চাষ করা হয়ে থাকে ;
৪. গভীরমূলীসহ সকল আগাছা দমিত হয় ;
৫. মাটিতে সহজে লাঙ্গল তল উৎপন্ন হয় না ;
৬. ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা কম ;
৭. ক্ষয়শীলতা কম।

মোল্ড বোর্ড লাঙ্গলের অসুবিধা

১. ওজনে ভারী ;
২. পশুর পক্ষে টানা অসুবিধাজনক ;
৩. স্থানান্তরে অসুবিধা হয় ;
৪. জমি কাদা করা অসুবিধাজনক ;
৫. মূল্য বেশি ;
৬. গঠন কিছুটা জটিল ;
৭. সর্বত্র পাওয়া যায় না ;
৮. পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা এখনও কম (এদেশে)।

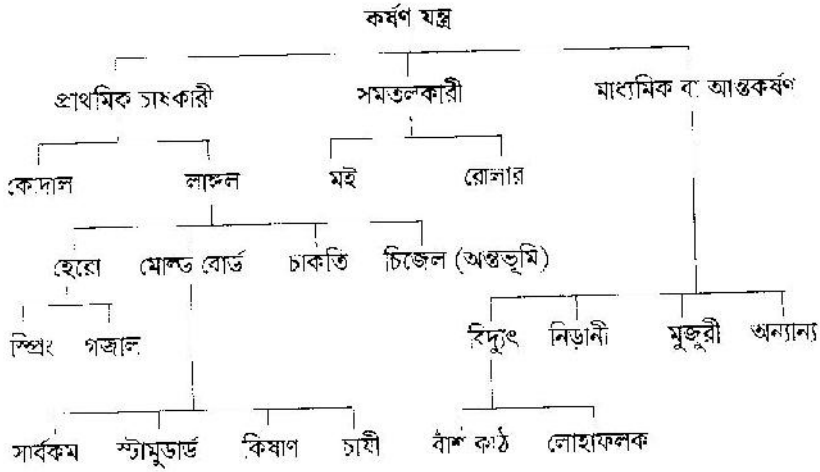

বাংলাদেশে পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টরের সুবিধা-অসুবিধা

ট্রাক্টরের সুবিধা	ট্রাক্টরের অসুবিধা
১. চাষের গভীরতা ও উৎকর্ষতা বেশি	১. মূল্য অনেক বেশি
২. আগাছা নিয়ন্ত্রণের খুবই কার্যকর	২. জ্বালানি ব্যয় বেশি
৩. ভূমি উন্নয়নের জন্য খুবই উপযোগী	৩. প্রস্তুত ও মেরামতের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন।
৪. ঢাল ও নিবিড় আগাছাপূর্ণ জমিচাষ সম্ভব	৪. ক্ষুদ্র জমিতে চালনা করা যায় না।
৫. হেক্টর প্রতি চাষ ব্যয় কম	৫. খুচরা যন্ত্রাংশ—এর মূল্যও বেশি।
৬. জমি প্রস্তুতে সময় কম প্রয়োজন হয়।	৬. বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।
৭. মালামাল পরিবহণ করা যায়।	৭. চলাচলের জন্য উন্নত রাস্তা দরকার।

কর্ষণ যন্ত্রপাতি মনোনয়নের উপাদান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূমিকর্ষণের প্রধান কাজ হচ্ছে বীজতলা ও মূল জমি প্রস্তুত, মৃত্তিকা সংরক্ষণ এবং সারের কার্যকারিতা বাড়ানো, আর্দ্রতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। এসব কাজের অধিকাংশই মৃত্তিকা গুণাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই কর্ষণ যন্ত্রপাতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে ফসলের প্রকৃতি সাপেক্ষে মাটির গুণাবলী প্রাথমিকভাবেই বিবেচ্য।

কর্ষণ যন্ত্র মনোনয়নের জন্য নিম্নরূপ উপাদান বিবেচনা করতে হয়—

১. ফসলের প্রকৃতি

ফসল যতো গভীরমূলী হবে, চাষও গভীর হবে; কন্দাল ফসলের জন্য ততো (যেমন—মূলা, গাজর) গভীর স্তর পর্যন্ত মাটি আলগা থাকা আবশ্যক।

পাপু
৪